মিসির আলির অমিমাংসিত রহস্য

হুমায়ূন আহমেদ





মিসির আলির অমিমাংসিত রহস্য

১

'আপনি কি ভূত দেখেছেন স্যার? ইংরেজিতে যাকে বলে spirit, ghost, astral body মানে প্রেতাত্মার কথা বলছি, অশরীরী......'

মিসির আলি প্রশ্নটির জবাব দেবেন কি না বুঝতে পারছেন না। কিছু মানুষ আছে যারা প্রশ্ন করে, কিন্তু জবাব শুনতে চায় না। প্রশ্ন করেই হড়বড় করে কথা বলতে থাকে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে আবার প্রশ্ন করে, আবার নিজেই জবাব দেয়। মিসির আলির কাছে মনে হচ্ছে তাঁর সামনের চেয়ারে বসে থাকা এই মানুষটি সেই প্রকৃতির। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গোলাকার মুখে পুরুষ্ট গোঁফ। কুস্তিগির-কুস্তিগির চেহারা। কথার মাঝখানে হাসার অভ্যাস আছে। হাসার সময় কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু সারা শরীর দুলতে থাকে। ওসমান গনি নামের এই মানুষটির প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্য নিঃশব্দে হাসার ক্ষমতা নয়; প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর নিচের পাটির একটি এবং ওপরের পাটির দু'টি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। যে-যুগে রুট ক্যানালিং-এর মতো আধুনিক দন্ত চিকিৎসা শুরু হয়েছে, সে-যুগে কেউ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধায় না। এই ভদ্রলোক বাঁধিয়েছেন। ধবধবে সাদা দাঁতের মাঝে ঝকঝকে তিনটি সোনালি দাঁত।

'কথা বলছেন না কেন স্যার, ভূত কি কখনো দেখেছেন?'

'জ্বি-না।'

'না-দেখাই ভালো। আম একবার দেখেছিলাম, এতেই অবস্থা কাহিল। ঘাম দিয়ে জ্বর এসে গিয়েছিল। এক সপ্তাহের উপর ছিল জ্বর। পায়ের পাতা চুলকাত। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল—অ্যালার্জি। ডাক্তারদের কারবার দেখুন, আমি বললাম, ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে। তার পরেও ডাক্তার বলে অ্যালার্জি। অ্যান্টি হিস্টামিন দিয়েছিল। অ্যান্টি হিস্টামিন কি ভূতের অষুধ, আপনি বলুন?'

মিসির আলি বললেন, 'আজ আমার একটু কাজ ছিল। বাইরে যাব। আপনি বরং অন্য একদিন আসুন, আপনার গল্প শুনব।'

'দশ মিনিট লাগবে স্যার। ভূতের গল্পটা বলেই চলে যাব। আমার সঙ্গে একটা

মাইক্রোবাস আছে, আপনি যেখানে যেতে চান আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। রিকন্ডিশান্ড মাইক্রোবাস। গত আগস্ট মাসে কিনেছি। দু' লাখ পঁচিশ নিয়েছে।'

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি কি খুব অল্পকথায় আপনার ভূত দেখার গল্প বলতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে বলুন, গল্প শুনব। খুব যে আগ্রহ নিয়ে শুনব তা না। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ভূতের গল্প খুব আগ্রহ করে শোনে। আমার বয়স একান্ন। তার চেয়েও বড় কথা ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম।'

'আমারো কম। খুবই কম। গল্পটা বলে চলে যাই স্যার।'

'আচ্ছা বলুন। আপনি কি এই গল্প শোনাতেই এসেছেন?'

'দ্যাটস কারেক্ট স্যার। আপনার ঠিকানা পেয়েছি আমার ভাগ্নির কাছ থেকে। সে বইটই পড়ে। বই পড়ে তার ধারণা হয়েছে আপনি দারুণ বুদ্ধিমান। অনেক বড় বড় সমস্যা নাকি সমাধান করেছেন। তখন ভাবলাম, যাই, ভদ্রলোককে দেখে আসি। বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ। গাধা টাইপের লোকের সঙ্গেও অবশ্যি কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। যাদের বুদ্ধি মাঝামাঝি, এদের সঙ্গে কথা বলে কোনো আনন্দ নেই। আমি আসায় বিরক্ত হন নি তো?'

'না, বিরক্ত হই নি। আপনার কি কোনো সমস্যা আছে?'

'না, কোনো সমস্যা নেই। প্রথম দিন ভূত দু'টাকে দেখে ভয় পেয়ে জ্বর হয়েছিল। এখন আর হয় না।'

'প্রায়ই দেখেন?'

'জ্বি-না। প্রায়ই দেখি না। ধরেন মাসে, দু'মাসে একবার।'

'এরা আপনাকে ভয় দেখায়?'

'না, ভয় দেখায় না। গল্পটা তাহলে বলি—'

'সংক্ষেপ করে বলুন, আমার এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আপনি স্যার কোনো চিন্তা করবেন না। আমার মাইক্রোবাস আছে। গত আগস্ট মাসে কিনেছি। নাইনটিন এইটি মডেল......'

'মাইক্রোবাসের কথা আগে একবার শুনেছি। ভূতের কথা কি বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।'

'ও হ্যাঁ—আমার হচ্ছে স্যার বিরাট ফ্যামিলি। পাঁচ মেয়ে। সব ক'টার চেহারা খারাপ। মা'র মতো মোটা, কালো, দাঁত উঁচু। একটারও বিয়ে হয় নি। এদিকে আবার আমার ছোট বোনটি মারা গেছে—তার তিন মেয়ে এক ছেলে উঠে এসেছে আমার বাড়িতে। গোদের উপর বিষফোঁড়া। আমার মা, এক খালাও সঙ্গে থাকেন। বাড়িভর্তি মেয়ে। একগাদা মেয়ে থাকলে যা হয়, দিন-রাত ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় ভিসিআর। রোজ রাতে এরা দু'টা করে ছবি দেখে। আমার মা চোখে কিছুই দেখেন না, তিনিও ভিসিআর-এর সামনে বসে থাকেন। শব্দ শোনেন। শব্দ শুনেই হাসেন-কাঁদেন। গলার আওয়াজ শুনে বলতে পারেন কে শ্রীদেবী, কে রেখা। এই হল স্যার বাড়ির অবস্থা।'

মিসির আলি হতাশ গলায় বলেন, 'আপনি মূল গল্পটা বলুন। আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলছেন।'

'মূল গল্পটা তাহলে বলি। বাড়ির মেয়েগুলির যন্ত্রণায় আমি রাতে ঘুমাই ছাদের চিলেকোঠায়। ছোট্ট ঘর। খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, শুধু বাথরুম নেই—এই একটা অসুবিধা। আমার আবার ডায়াবেটিস আছে, কয়েকবার প্রস্রাব করতে হয়। ছাদে প্রস্রাব করি। কাজের ছেলেটা সকালে এক বালতি পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়। কাজের ছেলেটার নাম হল ইয়াসিন।'

'প্লীজ, গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

'জ্বি স্যার, শেষ করছি। গত বৎসর চৈত্র মাসের ছয় তারিখের কথা। রাতে ঘুমাচ্ছি, প্রস্রাবের বেগ হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্প ছিল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালাম। তখনি দেখি ঘরের কোণায় দু'টা ভূত। খুব ছোট সাইজ, লম্বায় এই ধরেন এক ফুটের মতো হবে। গজ-ফিতা দিয়ে মাপি নি। চোখের আন্দাজ। দু'-এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হতে পারে।'

'তারা করছে কী?'

'বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। একজনের হাতে সবুজ মলাটের ময়লা একটা বই, অন্যজন সেই বই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। খিচ-খিচ, খিচ-খিচ করে কথা বলছে। আমি ওদের দিকে তাকাতেই কথা বন্ধ করে ফেলল। আমি তখনো ভয় পাই নি। কারণ হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে তো, এরা যে ভূত এইটাই বুঝি নি। কাজেই ধমকের মতো বললাম, 'এ্যাই, এ্যাই।'

'তখন কী হল?'

'ধমক শুনে হাত থেকে বই ফেলে দিল। তারপর মিলিয়ে গেল। তখন বুঝলাম, এরা ভূত। ছোট সাইজের ভূত। তখন ভয় লাগল। জ্বর এসে গেল।'

'এই আপনার গল্প?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন এখন উঠি।'

'ইন্টারেস্টিং লাগছে না স্যার?'

'জ্বি, ইন্টারেস্টিং।'

'ভূত এত ছোট সাইজের হয়, তা-ই জানতাম না। একটার আবার থুতনিতে অল্প দাড়ি, ছাগলা দাড়ি।'

'আসুন, আমরা উঠি।'

ওসমান গনি উঠলেন। মনে হল খুব অনিচ্ছায় উঠলেন। তাঁর আরো কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছা ছিল। মিসির আলি ঘরে তালা দিতে-দিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ওসমান গনির কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে—এই লোক তার 'ছোট ভূতের' গল্প বলার জন্য বারবার আসবে। নানানভাবে তাঁকে বিরক্ত করবে। একদল মানুষ আছে, যারা অন্যদের বিরক্ত করে আনন্দ পায়। ইনিও মনে হচ্ছে সেই দলের।

'স্যার।'

'বলুন।'

'ভূতদের ঐ বইটা ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি।'

'খুব ভালো করেছেন। এই বই তালাবন্ধ থাকাই ভালো।'

'একদিন আপনাকে দেখাতে নিয়ে আসব।'

'কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের বইয়ে আমার আগ্রহ আছে। ভূতের বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।'

'আমারও নেই। এই জন্যে ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। উল্টেও দেখি নি। তার উপর স্যার বইটা থেকে দুর্গন্ধ আসে। গো-মূত্রের গন্ধের মতো গন্ধ।'

ভদ্রলোক আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মনে হচ্ছে বইটি থেকে গো-মূত্রের গন্ধ আসায় তিনি আনন্দিত। মিসির আলি মনে বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। কঠিন গলায় বললেন, 'চলুন রওনা হওয়া যাক। আমার জরুরি কাজ আছে।'

'জ্বি আচ্ছা। কাজের সঙ্গে আপোস নাই। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। আমি তাহলে কাল আসি?'

'কাল আসার কি দরকার আছে?'

'দরকার আছে স্যার। ভূতের গল্পটা ভালোমতো বলা হয় নাই। ওরা আমার সঙ্গে কী-সব কথাবার্তা বলে—একটা আছে ফাজিল ধরনের, আমাকে ডাকে ছোট মামা।'

'ভাই শুনুন, আমার কাছে আসার আর দরকার নেই। আমি নিজে অসুস্থ। বিশ্রাম করছি।'

'আপনি তো স্যার বিশ্রামই করবেন। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবেন। আমি পাশে বসে গল্প বলব—'

'আপনি দয়া করে আর আসবেন না। আমি একা-একা বিশ্রাম করতে পছন্দ করি।'

'জ্বি আচ্ছা, আসব না। শুধু যদি স্যার আমাকে একটা উপদেশ দেন। কাগজে লিখে দেন, তাহলে খুব ভালো। উপদেশটা মানিব্যাগে রেখে দেব।'

মিসির আলি হতভম্ব গলায় বললেন, 'কী উপদেশ?'

'লিখবেন—"ওসমান গনি, আপনার মৃত্যু হবে পানিতে ডুবে। খুব সাবধান। খুব সাবধান।" এই লিখে আপনার নামটা সই করবেন।'

'আমি আপনার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ-সব কথা আমি কেন লিখব?'

'অকারণে লিখতে বলছি না স্যার। কারণ আছে। যে-ভূতটা আমাকে ছোট মামা ডাকে, সে আমাকে বলেছে—আমার মৃত্যু হবে পানিতে ডুবে। আমাকে সাবধান করে দিয়েছে। ভূতের কথা কে বিশ্বাস করে বলেন? কেউ বিশ্বাস করে না। আমিও করি না। এখন যদি আপনি দয়াপরবশ হয়ে লিখে দেন—'

'দেখুন ওসমান গনি সাহেব—এ-জাতীয় কথা আমি কখনো লিখব না। চলুন, আমরা ঘর থেকে বের হই। আকাশের অবস্থা ভালো না—ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

'লেখাটা না দিলে আমি স্যার যাব না। লিখে দিলে আর কোনোদিন এসে বিরক্ত করব না। আমি স্যার এককথার মানুষ। মানিব্যাগটা খুললেই আপনার লেখাটা চোখে পড়বে। তখন সাবধান হয়ে যাব। পানির ধারেকাছে যাব না।'

'এটা লিখে দিলে আপনি চলে যাবেন?'

'জ্বি।'

'আর কোনোদিন আসবেন না?'

'বললাম তো স্যার, আমি এককথার মানুষ।'

'বেশ, বসুন। লিখে দিচ্ছি।'

'চা খেতে ইচ্ছা করছে। চিনি ছাড়া এক কাপ চা কি হবে?'

'চা হবে না।'

'আপনার কি প্যাড আছে স্যার? প্যাডে লিখে দিলে ভালো হয়।'

'না, আমার প্যাড নেই।'

'তাহলে নাম সই করে ঠিকানা লিখে দেবেন। আর টেলিফোন নাম্বার, যদি টেলিফোন থাকে।'

'ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেলিফোন নেই।'

'টেলিফোন না-থাকাই ভালো। বড়ই যন্ত্রণা। এমন সব আজেবাজে টেলিফোন আসে! এই পর্যন্ত আছাড় দিয়ে আমি ক'টা টেলিফোন ভেঙেছি বলুন তো স্যার?'

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই নিন আপনার কাগজ। এখন চলুন, যাওয়া যাক। দয়া করে আবার এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'স্যার থ্যাংকস। খুব উপকার করেছেন।'

ওসমান গনি রাস্তায় নেমে বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কোনো মাইক্রোবাস দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার মাইক্রোবাস কোথায়?' ওসমান গনি খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'নতুন ড্রাইভার। বাস নিয়ে পালিয়ে গেছে বোধহয়। আপনি কী বলেন স্যার?'

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। যে-চায়ের দোকানের সামনে মাইক্রোবাসটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেই চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করা হল। সে বলল, তার দোকানের সামনে কখনোই কোনো মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে ছিল না।

ওসমান গনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। আমি এখন বাসায় যাব কী করে? আমার তো বাসার ঠিকানা মনে নেই।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাসার ঠিকানা মনে নেই মানে?'

'আমার কিছু মনে থাকে না। ও, আচ্ছা আচ্ছা, নোটবুকে ঠিকানা লেখা আছে। স্যার, আপনি আমাকে একটা রিকশা ঠিক করে দিন। আর নোটবই দেখে ঠিকানাটা রিকশাওয়ালাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কী যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম দেখুন তো!'

মিসির আলি নোটবই খুললেন। সেখানে প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজিতে লেখা—

"ইনি মানসিকভাবে অসুস্থ।

দয়া করে তাঁকে সাহায্য করুন। তাঁর বাসার ঠিকানা.............."

'স্যার, ঠিকানাটা লেখা আছে না?'

'আছে।'

'পরের পৃষ্ঠায় ডায়াগ্রাম আছে। ডায়াগ্রাম দেখে রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিন, ও নিয়ে যাবে।'

মিসির আলি নোটবই হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ-জাতীয় ঝামেলায় তিনি আগে পড়েন নি। ওসমাস গনি নিজেই রিকশা ডেকে আনলেন। তাঁকে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। মিসির আলি রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে যেতে হবে। ওসমান গনি বললেন, 'স্যার, তাহলে যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। কারো সঙ্গে কথা

বলে আজকাল আরাম পাই না। এই জন্যেই ছাদের ঘরে একা-একা থাকি। বড় ভালো লাগল স্যার। তবে সব ভালো দিকের যেমন মন্দ দিক আছে—এটারও আছে। মাইক্রোবাসটা চুরি হয়ে গেল। বাসায় ফিরেও শান্তি নেই। থানা-পুলিশ করতে হবে।

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি আসব আপনার সঙ্গে?'

ওসমান গনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না না। কোনো প্রয়োজন নেই। এ-রকম আগেও হয়েছে, রিকশা করে চলে গেছি। আচ্ছা স্যার, যাই। আপনিও বাসায় চলে যান। রাত অনেক হয়ে গেছে। এত রাতে কোথাও যাওয়া ঠিক না। তা ছাড়া আমার মনে হয় আপনার আসলে কোথাও যাবারও কথা না। আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য বলেছেন—"কাজ আছে।" বুদ্ধিমান লোকেরা এ-রকম করে। আপনি স্যার আসলেই বুদ্ধিমান।' ওসমান গনি নিঃশব্দে গা দুলিয়ে হাসতে লাগলেন।

মিসির আলি ঘরে ফিরলেন খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে। বিভ্রান্তির অনেকগুলি কারণ। প্রথম কারণ—ওসমান গনিকে মানসিক রুগী বলে মনে হচ্ছে না। যে-মানুষ খুঁজে খুঁজে তার ঠিকানা বের করতে পারে, সে নোট বইয়ে লেখা পড়ে বাসায় ফিরে যেতে পারে না, তা হয় না।

লোকটি যে পাগল সাজার ভান করছে তাও না। যে ভান করবে, সে সারাক্ষণই করবে। আসল পাগলের চেয়ে নকল পাগল অনেক বেশি পাগলামি করে। মিসির আলি যে তাকে বিদেয় করবার জন্যে বলছেন-'তাঁর কাজ আছে', এই ব্যাপারটি ওসমান গনির কাছে ধরা পড়েছে। নকল পাগল হলে তা সে কখনো স্বীকার করত না। চেপে যেত। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? রাতে ঘুমুতে যাবার সময় মিসির আলি বালিশের কাছে রাখা খাতায় পেনসিলে অস্পষ্টভাবে লিখলেন—

নাম ঃ ওসমান গনি।
বয়স ঃ পঞ্চাশের কাছাকাছি।
বিশেষত্ব ঃ তিনটি সোনাবাঁধানো দাঁত। হাসেন কোনো রকম শব্দ না করে।

(১) কেন এসেছিলেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে না।
(২) অন্যরা দাবি করছে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি নিজে দাবি করছেন না।
(৩) তবে তিনি যে ভৌতিক গল্পের কথা বলছেন, তা মানসিক অসুস্থতার দিকেই ইঙ্গিত করে।
(৪) লোকটি বিত্তবান বলেই মনে হল। কারণ তিনি যে-তেতলা বাড়ির কথা বললেন, সেই বাড়িটি তাঁর হওয়ারই সম্ভাবনা। নোটবইয়ের ঠিকানায় গুলশানের কথা লেখা। গুলশান বিত্তবানদের এলাকা।
(৫) ভদ্রলোকের হাতে পাথর-বসানো তিনটি আঙটি, ব্যবসায়ীরা সাধারণত পাথর-টাথরে বিশ্বাসী হয়। তিনি সম্ভবত একজন ব্যবসায়ী।

রাত এগারটা পাঁচ মিনিটে মিসির আলি বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। কঠিন নিয়মে তিনি এখন নিজেকে বাঁধার চেষ্টা করছেন। ঘুম আসুক না-আসুক, রাত এগারটা বাজতেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়বেন। ঘুম আনানোর যে-সব প্রক্রিয়া আছে সেগুলি প্রয়োগ করবেন। তার পরেও যদি ঘুম না আসে কোনো ক্ষতি নেই। বিছানায়

গড়াগড়ি করবেন। উঠবেন ভোর পাঁচটায়। ঘুম পাড়িয়ে দেবার কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু ঘুম ভাঙানোর যন্ত্র আছে। তিনি দু' শ' ত্রিশ টাকা দিয়ে একটি অ্যালার্ম-ঘড়ি কিনেছেন। এই ঘড়ি ভোর পাঁচটায় এমন হৈচৈ শুরু করে যে, কার সাধ্য বিছানায় শুয়ে থাকে! বিজ্ঞানের এই সাফল্যের দিনে ঘুম আনার যন্ত্র বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অ্যালার্ম-ঘড়ি যে-হারে বিক্রি হয়, ঘুম-ঘড়িও সেই হারে বিক্রি হবে।

ঘুম আনানোর প্রক্রিয়াগুলি কাজ করছে না। মিসির আলি সাত শ' ভেড়া গুনলেন। এই গুণন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্লান্ত হয়ে যাবার কথা। ক্লান্ত হবার পরিবর্তে মস্তিষ্ক আরো উত্তেজিত হল। মনে-মনে গল্প বললেও নাকি ঘুম আসে। গল্প বলার সময় ভাবতে হয়, এক দল ঘুম-ঘুম চোখের শিশুরা গল্প শুনছে। মিসির আলি গল্প শুরু করলেন। সব গল্প শুরু হয় এইভাবে—এক দেশে ছিল এক রাজা। তাঁর গল্পটা একটু অন্য রকম হল—এক দেশে ছিল এক রানী। রানীর দুই রাজা। সুয়োরাজা এবং দুয়োরাজা। সুয়োরাজাটা বড়ই ভালো..........।

কল্পনার শিশুদের একজন প্রশ্ন করল, 'সুয়োরাজার নাম কি?'

'সুয়োরাজার নাম হচ্ছে ওসমান গনি। মোটাসোটা একজন মানুষ, পঞ্চাশের মতো বয়স। হাতে তিনটা আঙটি। এর মধ্যে একটা আঙটি হচ্ছে নীলার। সুয়োরাজার তিনটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো.......'

কল্পনার শিশুটি বলল, 'এ আবার কেমন রাজা?'

মিসির আলি বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। বাতি জ্বালালেন না, অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে পানি ঢাললেন। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন, যদিও তাঁর বর্তমান নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতিতে রাত এগারটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কোনো সিগারেট খাবার ব্যবস্থা নেই। তিনি একধরনের অস্বস্তি বোধ করছেন, একধরনের বিভ্রান্তি—যা ওসমান গনি নামের মানুষটি তৈরি করে গেছেন। মাথা থেকে বিভ্রান্তি তাড়াতে পারছেন না। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। বারান্দায় প্রচুর হাওয়া, আকাশ মেঘলা। শ্রাবণের ধারাবর্ষণ সম্ভবত শুরু হবে। তাঁর শীত-শীত লাগছে। জ্বলন্ত সিগারেট হাতে নিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সিগারেট পুড়তে-পুড়তে একসময় তাঁর হাতেই নিভে গেল। তাঁর ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। দু' শ' ত্রিশ টাকায় কেনা অ্যালার্ম-ঘড়ি তাঁকে যথাসময়ে ডেকে তুলল।

তিনি হাতমুখ ধুলেন। কেরোসিন কুকারে চা বানিয়ে খেলেন। খানিকক্ষণ ফ্রী-হ্যান্ড একসারসাইজ করলেন। এও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতির অংশ। ডাক্তার বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন। পাথরের মতো মুখ করে বলেছেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনার শরীরের কলকব্জা সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা কি আপনি জানেন?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'জানি।'

'আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চান, না এখনি মরে যেতে চান?'

'অল্প কিছুদিন বাঁচতে চাই।'

'কতদিন?'

'এই ধরুন এক বৎসর।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন ডাক্তার বলবেন, এক বৎসর কেন? ডাক্তার সে-প্রশ্ন করলেন না, খসখস করে প্রেসক্রিপশনে একগাদা কথা লিখতে লাগলেন।

ভোরবেলা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে পনের মিনিট ফ্রী–হ্যান্ড একসারসাইজ হচ্ছে তার একটি। একসারসাইজের পর এক ঘন্টা প্রাতঃভ্রমণের ব্যাপার আছে। ডাক্তার সাহেব লিখে দিয়েছেন—ঝড় হোক, টাইফুন হোক, ভূমিকম্প হোক—এক ঘন্টা হাঁটতেই হবে।

এখন ঝড়, টাইফুন বা ভূমিকম্প কোনোটাই হচ্ছে না। টিপটিপ করে বৃষ্টি অবশ্যি পড়ছে। সেই বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বের হওয়া যায়। ছাতা মাথায় প্রাতঃভ্রমণ মন্দ নয়। সকালবেলা এই বেড়ানোটা তাঁর খারাপ লাগে না। বিচিত্র সব চরিত্র দেখা যায়। একদল মানুষ প্রাতঃভ্রমণকে প্রায় উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। উপাসনার যেমন কিছু নিয়ম আছে, এদেরও আছে। আরেক দল আছে 'খাদক' জাতীয়। ভ্রমণের এক পর্যায়ে বিশাল টিফিন–ক্যারিয়ার খুলে হাউহাউ করে পরোটা–গোস্ত যেভাবে গিলতে থাকেন, তাতে মনে হয় তাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছে খোলা মাঠে বসে গোস্ত–পরোটা খাবার জন্যে।

মিসির আলি বেরুবার মুখে বাধা পেলেন। গেটের কাছে আসতেই ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসী এক ভদ্রলোক এসে শীতল গলায় বললেন, 'আপনি কি বেরুচ্ছেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে ওসমান গনি নামের কেউ কি আপনার কাছে এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন।'

'ঐ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলব। আমি পুলিশের লোক। ইন্সপেক্টর অব পুলিশ। আমার নাম রকিবউদ্দিন।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'ওসমান গনি কি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, মারা গেছেন। আপনি কী করে জানলেন?'

'অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি ভালো।'

'অনুমানশক্তি ভালো থাকাই ভালো। আসুন, কথা বলি। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হোম মিনিস্টার নিজেই ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন। বেশিক্ষণ আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। প্রাথমিকভাবে আধ ঘন্টার মতো কথা বলব। পরে আবার আসব।'

'রকিবউদ্দিন সাহেব, এখন তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। এখন মর্নিং–ওয়াকে যাচ্ছি। এক ঘন্টা মর্নিং–ওয়াক করব। আপনাকে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

'এক ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, আপনাকে এক্ষুণি কথা বলতে হবে।'

'এমন কোনো আইন কি আপনাদের আছে যে পুলিশ যখন কথা বলতে চাইবে তখনি কথা বলতে হবে?'

'আইনের বিষয় নয়, হোম মিনিস্টার নিজে বলেছেন। তিনি বিষয়টায় খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন।'

'আমি এই মুহূর্তে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছি না। কাজেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আমার ঘরের চাবি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আমার ঘরে অপেক্ষা করতে পারেন। তবে আপনার যদি ধারণা হয় আমি পালিয়ে যেতে পারি, তাহলে আপনি আমার সঙ্গেও আসতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব। আপনি দেরি করবেন না। দিন, ঘরের চাবি দিন।'

মিসির আলি চাবি দিয়ে গেট খুলে রওনা হলেন। রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে একবার পিছনে ফিরলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব আগের জায়গায় চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোকের মুখ শ্রাবণ মাসের আকাশের চেয়েও মেঘলা।

বৃষ্টি জোরেসোরে পড়া শুরু করেছে। রাস্তায় নোংরা পানি। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ময়লা পানিতে ডুবিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যাবার কোনো মানে হয় না—তবু মিসির আলি যাচ্ছেন। ঝড় হোক, টাইফুন হোক, ভূমিকম্প হোক—তাঁকে এক ঘন্টা হাঁটতে হবে। সকালের খোলা হাওয়া গায়ে লাগাতে হবে। এক বৎসর তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। দেখা যাক, ডাক্তারের উপদেশ মেনে কতদূর কি হয়।

আজ শরীর অন্যদিনের চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে। চোখ জ্বালা করছে, কোনো কিছুর দিকেই বেশি সময় তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হতে শুরু করেছে। শুধু শরীর নয়—মনও নষ্ট হতে শুরু করেছে। ওসমান গনির মৃত্যুসংবাদ তাঁকে বিচলিত করে নি। করা উচিত ছিল। খ্রিস্টানরা মৃত্যুসংবাদে গির্জায় ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজায়। নিয়মটা সুন্দর। সবাইকে জানিয়ে দেয়া—শোন, তোমরা শোন! তোমাদের একজন চলে গিয়েছে—ঢং ঢং ঢং . . . . .

'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

মিসির আলি তাকালেন-অপরিচিত একজন মানুষ। অপরিচিত মানুষদের প্রশ্নের জবাব খুব অল্প কথায় দিতে হয়, কিন্তু মিসির আলি একটি দীর্ঘ বাক্য বললেন, 'আমি ভালো না। শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—মনও নষ্ট হচ্ছে। অপেক্ষা করছি ঘন্টার জন্যে, ঢং ঢং ঢং। তাই যাই।"

অপরিচিত ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তিনি এতটা অবাক হচ্ছেন কেন তাও মিসির আলি ধরতে পারলেন না।

২

পুলিশের লোকদের বিব্রত করে সবাই বোধহয় এক ধরনের আনন্দ পায়। এক ঘন্টার জায়গায় মিসির আলি দু' ঘন্টা দেরি করে ফেললেন। ভ্রমণ শেষ করে হোটেল রহমানিয়ায় নাশতা করলেন।ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ক'টা পত্রিকা পড়লেন। গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যুর কথা খবরের কাগজে থাকবেই। ওসমান গনি সম্পর্কিত কোনো খবর কোনো পত্রিকাতেই নেই। হোম মিনিস্টারের কাছে মানুষটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও খবরের কাগজের লোকদের কাছে হয়তো নয়। হোটেল রহমানিয়া থেকে বের হয়ে তিনি নিতান্তই অকারণে নিউমার্কেট কাঁচা-বাজারে গেলেন। ভোরবেলা এখানে মাছের পাইকারি কেনা-বেচা হয়। গাদাগাদি করে রাখা মাছের স্তূপ হাঁকডাক হয়ে বিক্রি হয়। যারা কেনে, তারা মুখ কালো করে কেনে, যারা বিক্রি করে তারাও মুখ কালো করে বিক্রি করে। দেখতে মজা লাগে।

মিসির আলি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'এক ঘন্টার কথা বলেছিলাম, একটু দেরি হল।'

ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট

দেরি করেছেন।'

বোঝাই যাচ্ছে মানুষটি বিরক্ত। পুলিশের লোকদের বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি অন্যদের মতো নয়। রকিবউদ্দিন তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করছেন ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। রকিবউদ্দিনের সঙ্গে আরো একজনকে দেখা যাচ্ছে। সে মনে হচ্ছে পদমর্যাদায় ছোট। ঘরে আরো চেয়ার থাকতেও বসেছে মোড়ায়। তার হাতে কাগজ এবং কলম।

মিসির আলি বললেন, 'আপনারা কি চা খাবেন? চা করি?'

'চা খাব না। আপনি আমার সামনে বসুন। কথার জবাব দিন।'

'আপনি এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন আমি একজন আসামী। আমি কি আসামী?'

'খুন যখন হয়, তখন খুনীর পরিচিত সবাইকেই আসামী ভেবে নিয়ে পুলিশ এগোয়।'

'ওসমান গনি খুন হয়েছেন?'

'আপনি প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করার কাজটা আমি করব। আপনি উত্তর দেবেন।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

'আপনি দাঁড়িয়ে না-থেকে আমার সামনের চেয়ারটায় বসুন।'

'চেয়ারে না-বসে আমি বরং খাটে বসি। পা তুলে বসা আমার অভ্যাস। আপনারা শোবার ঘরে চলে আসুন। আমি খাটে পা তুলে বসব, আপনারা চেয়ারে বসবেন।'

রকিবউদ্দিন কঠিন মুখে বললেন, 'আমি অন্যের শোবার ঘরে ঢুকি না। কথাবার্তা যা হবার এখানেই হবে।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

রকিবউদ্দিনের সঙ্গের লোকটি খাতা এবং পেন্সিল হাতে তৈরি। মনে হচ্ছে শর্টহ্যাণ্ড-জানা কেউ। আজকালকার পুলিশদের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড-জানা লোকজন হয়তো থাকে, মিসির আলি জানেন না। পুলিশের সঙ্গে তাঁর সে-রকম যোগাযোগ কখনো ছিল না। প্রশ্নোত্তর শুরু হল। প্রশ্নের ধারা দেখে মনে হচ্ছে রকিবউদ্দিন দীর্ঘ দেড় ঘন্টা বসে-বসে সব প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছেন। কোনটির পর কোনটি করবেন তা-ও ঠিক করে রাখা। তবে প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রাণ নেই। প্রতিটি প্রশ্ন একই ভঙ্গিতে করা হচ্ছে। স্বরের ওঠানামা নেই, রোবট-গন্ধী প্রশ্ন।

ইন্সপেক্টর : মিসির আলি সাহেব।

মিসির : জ্বি?

ইন্সপেক্টর : আপনি কী করেন?

মিসির : এক সময় অধ্যাপনা করতাম। এখন কিছু করি না।

ইন্সপেক্টর : কিছু না-করলে আপনার সংসার চলে কী করে?

মিসির : আমার সংসার নেই। একা মানুষ। কোনো-না-কোনোভাবে চলে যায়।

ইন্সপেক্টর : একা মানুষদেরও বেঁচে থাকার জন্যে টাকা লাগে। সেই টাকাটা আসে কোত্থেকে?

মিসির : ওসমান গনির মৃত্যুর সঙ্গে আপনার এই প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক ধরতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর : আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনাকে সম্পর্ক খুঁজতে হবে না।

মিসির : বাজারে আমার লেখা কিছু বই আছে, পাঠ্য বই। বইগুলি থেকে রয়েলটি পাই।

ইন্সপেক্টর : বাড়ি ভাড়া কত দেন?

মিসির : আগে দিতাম পনের শ' টাকা। ইলেকটিসিটি এবং পানিসহ। এখন কিছু দিতে হয় না।

ইন্সপেক্টর : দিতে হয় না কেন?

মিসির : বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের একটা সামান্য সমস্যার আমি সমাধান করেছিলাম। তারপর থেকে উনি ভাড়া নেন না।

ইন্সপেক্টর : কী সমস্যা?

মিসির : ভৌতিক সমস্যা। ওঁর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব ছিল। সেই উপদ্রব দূর করেছি।

ইন্সপেক্টর : আপনি কি ভূতের ওঝা নাকি?

মিসির : আমি ভূতের ওঝা নই। অবশ্যি এক অর্থে ভূতের ওঝা বলতেও পারেন। কিছু মনে করবেন না। আপনার প্রশ্নের ধারা আমি বুঝতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর : ওসমান গনি সাহেব কি মাঝে–মাঝে আপনাকে অর্থসাহায্য করতেন?

মিসির : না। গতকালই আমি তাঁকে প্রথম দেখি।

ইন্সপেক্টর : আপনি বলতে চাচ্ছেন যে উনি আপনার কাছে এসেছিলেন?

মিসির : জ্বি।

ইন্সপেক্টর : উনি কখন এসেছিলেন আপনার কাছে?

মিসির : উনি রাত আটটার সময় এসেছিলেন, সাড়ে ন'টায় চলে যান।

ইন্সপেক্টর : ওঁর সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

মিসির : আমি কিছুই জানি না।

ইন্সপেক্টর : আপনি মিথ্যা কথা বললেন, কারণ উনি যে ব্যবসায়ী তা আপনি জানতেন। আপনার শোবার ঘরের বালিশের কাছে রাখা একটা খাতায় আপনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন।

মিসির : জেনে লিখি নি, অনুমান করে লিখেছি। আরেকটি কথা, খানিকক্ষণ আগে যে বললেন আপনি কারোর শোবার ঘরে ঢোকেন না, তা ঠিক নয়। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে আমার শোবার ঘরে ঢুকেছেন।

ইন্সপেক্টর : সন্দেহজনক জায়গায় অনুসন্ধান চালানোর অধিকার পুলিশের আছে।

মিসির : তার জন্যে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগে। আপনার কি সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

ইন্সপেক্টর : মিসির আলি সাহেব, আমার সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। আমি কাঁচা কাজ কখনো করি না। দেখতে চান?

মিসির : দেখতে চাই না। বুঝতে পারছি আপনি সত্যি কথা বলছেন। আর কী জানতে চান বলুন।

ইন্সপেক্টর : ওসমান গনি সাহেব ঠিক কী কারণে এসেছিলেন?

মিসির : ঠিক কী কারণে এসেছিলেন তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। দুটো ছোট সাইজের ভূতের কথা বললেন, আমার কাছে মনে হল তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ।

ইন্সপেক্টর : আপনার ধারণা উনি মানসিক রুগী?
মিসির : আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।
ইন্সপেক্টর : তাঁর হত্যাকারীর নাম তিনি আপনাকে বলে গেছেন? সেই নাম বলুন।
মিসির : আপনার কথায় আমি বিস্মিত বোধ করছি। এ-ধরনের কোনো কথাই হয় নি। তা ছাড়া শুধু-শুধু তিনি আমাকে হত্যাকারীর নাম বলতে যাবেন কেন?
ইন্সপেক্টর : এটা আমাদেরও প্রশ্ন। আচ্ছা, উনি যখন কথা বলছিলেন, তখন কোনো বিশেষ কিছু কি আপনার নজরে পড়েছে?
মিসির : আমি খুব খুঁটিয়ে ওকে লক্ষ করি নি। তাঁর সোনাবাঁধানো তিনটা দাঁত দেখে বিস্মিত হয়েছি। এ-যুগে সোনা দিয়ে কেউ দাঁত বাঁধায় না।
ইন্সপেক্টর : উনি কি আপনাকে বললেন যে ওর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো? নাকি এও আপনার অনুমান?

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনুমান নয়, দেখলাম।'

ইন্সপেক্টর সাহেব মুখ বিকৃত করলেন। মনে হচ্ছে মিসির আলির কোনো কথাই তিনি বিশ্বাস করছেন না। মিসির আলির কাছে মনে হল পুরো ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একবার জট পাকাতে শুরু করলে জট পাকানোর প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটতে থাকে। মিসির আলি বললেন, 'ওসমান গনি যে আমার কাছে এসেছিলেন, এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন?'

ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন যন্ত্রের মতো বললেন, 'ওঁর লেখার টেবিলে আপনার লেখা একটা চিরকুট ছিল। আপনার ঠিকানাও সেই চিরকুটে লেখা। দেখুন তো এই হাতের লেখাটি আপনার?'

'জ্বি, আমার।'

'চিরকুটে এই জাতীয় কথা আপনি কেন লিখলেন।'

'উনি লিখতে বললেন বলেই লিখলাম।'

'কেউ কিছু লিখতে বললেই আপনি লিখে দেন?'

'না, তা দিই না। তবে মানুষটা যদি উন্মাদ হয় এবং কিছু লিখে না-দিলে যদি তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় না থাকে, তখন লিখে দিতে হয়। আমার পরিস্থিতিতে আপনি যদি পড়তেন তাহলে বুঝতেন।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন ওসমান গনি একজন উন্মাদ?'

'মানসিকভাবে সুস্থ না তো বটেই।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন লিখে নিচ্ছি এবং ধরে নিচ্ছি যা বলছেন সবই সত্য।'

'মিথ্যা বলার আমার কোনো কারণ নেই।'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, আমি সতের বছর ধরে পুলিশে চাকরি করছি। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কারণে মিথ্যা বলার চেয়ে অকারণে মিথ্যা বলতে মানুষ বেশি পছন্দ করে।

'আপনার অবজারভেশন ঠিক আছে।'

রকিবউদ্দিন উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, 'এখন আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায়?'

'ওসমান গনি সাহেবের ডেড বডি দেখবেন।'

'তার কি প্রয়োজন আছে? মৃত মানুষ দেখতে ভালো লাগে না।'

'মৃত মানুষ দেখতে কারোরই ভালো লাগে না। আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে বলছি—আপনি আসুন।'

'চলুন।'

কিছুই মিলছে না। গুলশানের অভিজাত এলাকায় তেতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে বিশাল লন। ফোয়ারা আছে, মার্বেল পাথরের একটি শিশু ফোয়ারার মধ্যমণি। চারদিক থেকে তার গায়ে পানি এসে পড়ছে। বাড়ির সামনে কোনো ফুলের বাগান নেই। ঘাসে ঢাকা লন, ঢেউয়ের মতো উঁচুনিচু করা। মনে হয়, বাড়ির সামনে ঢেউ খেলছে। বাড়ির প্যাটার্নও জাহাজের মতো। ফুলের বাগান বাড়ির দু'পাশে। দেশিফুলের প্রচুর গাছ।

মিসির আলিকে গেটের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কড়া পুলিশ পাহারা। কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না। রকিবউদ্দিন ভেতরে গেলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে এসে মিসির আলিকে নিয়ে গেলেন। দোতলার ঘরে নিচু খাটের ওপর মৃতদেহ শোয়ানো। সাধারণত মরা-বাড়িতে হৈচৈ কান্নাকাটি হতে থাকে। এখানে তার কিছুই নেই। ঘরের এক কোণায় রাখা গদিআঁটা চেয়ারে একটি অল্পবয়সী মেয়ে পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। মেয়েটি একদৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির মাথার চুল খুব লম্বা। গায়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের শাড়ি। খাটের এক কোণায় যিনি বসে আছেন, তিনি সম্ভবত ডাক্তার। সাফারির পকেট থেকে স্টেথেসকোপের মাথা বের হয়ে আছে। মৃত মানুষদের জন্যে কোনো ডাক্তার প্রয়োজন হয় না। উনি কেন আছেন কে জানে। ঘরের ভেতর একজন পুলিশ অফিসার আছেন। তাঁকে একইসঙ্গে নার্ভাস এবং বিরক্ত মনে হচ্ছে। তিনি স্থির হয়ে এক সেকেন্ডও দাঁড়াচ্ছেন না।

সাধারণত মৃতদেহ চাদরে ঢাকা থাকে। এ-ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। মৃতদেহের মুখের ওপর কোনো চাদর নেই। মিসির আলি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিস্মিত হবার সঙ্গত কারণ ছিল।

রকিবউদ্দিন বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, ভালো করে দেখুন। উনিই কি আপনার কাছে গিয়েছিলেন?'

'না, উনি যান নি।'

'দাঁত দেখার প্রয়োজন আছে?'

'না, দাঁত দেখার প্রয়োজন নেই। যিনি আমার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি মোটাসোটা ধরনের খাটো মানুষ। গায়ের রঙ শ্যামলা।'

'যিনি আপনার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন যে তাঁর নাম ওসমান গনি?'

'জ্বি।'

গদিতে বসে থাকা মেয়েটি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এখানে এত কথা বলছেন কেন? কথা বলার জায়গার তো অভাব নেই।'

রকিবউদ্দিন মিসির আলিকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলেন। মিসির আলি বললেন,

'আমি কি চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'দরকার হবে বলে মনে করছেন?'

রকিবউদ্দিন ভাবলেশহীন গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি না। এটা একটা সিম্পল কেইস অব স্যুইসাইড। বাথরুমের ভেতর তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙা হয়।'

'ও।'

'আত্মহত্যা সম্পর্কে একটা নোট রেখে গেলে আর কোনো সমস্যা ছিল না। নোটটোট নেই—উল্টো আপনার সম্পর্কে আজগুবি কিছু কথা লেখা।'

'আপনার তাহলে ধারণা হচ্ছে কথাগুলি আজগুবি?'

'হ্যাঁ, তাই ধারণা হচ্ছে। পয়সা বেশি হলে মানুষ কিছু-কিছু পাগলামি করে। এইসব কিছু করেছেন। একজন কাউকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সে গিয়ে বলেছে তার নাম ওসমান গনি। হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'আচ্ছা, আপনি চলে যান। প্রয়োজন হলে আবার যোগাযোগ করব। তবে প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। এটা একটা আত্মহত্যা। এ-ব্যাপারে সবাই স্যাটিসফায়েড। ফ্যামিলির তরফ থেকে তা-ই বলা হয়েছে।'

'পোস্ট মর্টেম হবে না?'

'হওয়া তো উচিত। অপঘাতে মৃত্যুর সুরতহাল হতে হয়। তবে এরা হচ্ছে সমাজের মাথা। এদের জন্যে নিয়ম-কানুন ভিন্ন।'

রকিবউদ্দিন গেট পর্যন্ত মিসির আলিকে এগিয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, 'এদের আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি? যে- বাথরুমে উনি মারা গেলেন সেই বাথরুমটা দেখতে পারি?'

রকিবউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'কেন?'

'এম্নি। কারণ নেই কোনো। কৌতূহল বলতে পারেন।'

'এইসব বিষয়ে কৌতূহল যত কম দেখাবেন ততই ভালো। বাড়িতে যান। আরাম করে ঘুমান।'

'জ্বি আচ্ছা। সবুজ শাড়িপরা মেয়েটি কি ওঁর আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, আত্মীয়। নাদিয়া গনি। রবীন্দ্রসংগীত করেন, নাম জানেন না?'

'না। ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে. . . . . .'

'বাড়ি যান তো—যন্ত্রণা করবেন না।'

মিসির আলি বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। অসময়ে দীর্ঘ ঘুম। ঘুম ভাঙলো দুপুর দুটোর দিকে। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। খেতে হবে হোটেলে। বাইরে বেরুবার উপায় নেই—ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা খাতাটা নিলেন—ওসমান গনি প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়েছে। কথাটা লিখে রাখা দরকার। পাতা ওল্টাতে লাগলেন—ওসমান গনি সম্পর্কে যে-পাতায় লিখেছিলেন, ঐ পাতাটা ছেঁড়া। ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যার মধ্যে মিসির আলি আরো একটি তথ্য আবিষ্কার করলেন। তাঁর বাড়ির

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন কেউ তাঁর ওপর লক্ষ রাখছে। পুলিশের লোক বলেই মনে হল। সন্ধ্যার পর ডিউটি বদল হল। অন্য একজন এল। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। বেচারাকে ছাতামাথায় হাঁটাহাটি করতে হচ্ছে। কে জানে তাকে সারা রাতই এভাবে কাটাতে হবে কি–না।

রাত ন'টার দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলে মিসির আলি রাতের খাবার খেতে বের হলেন। ছাতামাথায় লোকটি নিরীহ ভঙ্গিতে চট করে গলিতে ঢুকে পড়ল। মিসির আলিও সেই গলিতে ঢুকলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার ওপর লক্ষ রাখছেন?'

সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'জ্বি–না স্যার।'

'আপনি পুলিশের লোক তো?'

'জ্বি স্যার, আমি পুলিশের লোক। তবে আমি আপনার ওপর লক্ষ রাখছি না। বিশ্বাস করুন স্যার।'

'বিশ্বাস করছি, আমি হোটেল রহমানিয়ায় ভাত খেতে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

'আমি স্যার খেয়ে এসেছি।'

মিসির আলি লম্বা–লম্বা পা ফেলে হোটেলের দিকে রওনা হলেন। তাঁকে তেমন চিন্তিত মনে হল না। যদিও চিন্তিত হবার কথা। পুলিশের একজন লোক সারাক্ষণ তাঁর ঘরের দিকে লক্ষ রাখবে, এটা স্বস্তিবোধ করার মতো কোনো ঘটনা নয়। নিতান্ত সম্পর্কহীন একটা লোক তাঁর সম্পর্কে ডাইরিতে কেন লিখবে? ওসমান গনি সেজে কেনই বা একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে? একটা সময় ছিল, যখন এ–জাতীয় সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগত। এখন লাগে না। ক্লান্তিবোধ হয়। তিনি সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছেন, পৃথিবীতে জটিল সমস্যা বলে কিছু নেই। পৃথিবীর নিজস্ব একধরনের সারল্য আছে। সে– কারণেই পৃথিবীর সব সমস্যাই সরল সমস্যা। কিন্তু আসলেই কি তাই? তাঁর ভাবতেও ভালো লাগছে না। ওসমান গনির বিষয়টা নিয়ে তেমন কৌতূহলও কেন জানি বোধ করছেন না। ওসমান গনি ধনবান এবং সম্ভবত ক্ষমতাবান একজন মানুষ ছিলেন। জীবনে যা পাওয়ার সব পেয়ে যাবার পর আত্মহনন করলেন। ঘটনাটা ঘটাবার আগে ছোট্ট একটা রসিকতা করলেন। এর বেশি কি? মৃত্যু কীভাবে হল আগামীকালের খবরের কাগজ পড়ে জানা যাবে। কিংবা কে জানে খবরের কাগজে হয়তো কিছু থাকবে না। ক্ষমতাবান মানুষদের কোন খবরটি পত্রিকায় যাবে, কোনটি যাবে না—তাও তাঁরা ঠিক করে দেন।

মিসির আলি ভাত ডাল এবং এক পিস ইলিশ মাছ দিয়ে রাতের খাবার শেষ করলেন। ইলিশ মাছ খাওয়াটা ঠিক হয় নি। গলায় কাঁটা বিঁধে গেছে। ঢোক গিললেই কাঁটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এম্নিতে কিছু বোঝা যায় না। মুশকিল হচ্ছে গলায় কাঁটা বিঁধলেই অকারণে কিছুক্ষণ পরপর ঢোক গিলতে ইচ্ছা করে।

বাসায় ঢোকবার মুখে বাড়িয়ালার ছেলের বউ দিলরুবার সঙ্গে দেখা। দিলরুবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। মিসির আলি লক্ষ করেছেন, এই মেয়েটি বৃষ্টি দেখতে পছন্দ করে। বৃষ্টি হলেই মেয়েটিকে তিনি বারান্দায় দেখেন। দিলরুবা খুশি–খুশি গলায় ডাকল, 'মিসির চাচা। আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

'কিছু হয় নি, কী হবে?'

'আজ সকালে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। আপনি বাবাকে চিনতে পারেন নি। হড়বড় করে একগাদা কথা বলেছেন। ঘন্টা বাজছে—ঢং ঢং ঢং . .'

দিলরুবা খিলখিল করে হাসছে। মেয়েটির হাসিমুখ দেখতে ভালো লাগছে।

'আপনার শরীর ভালো আছে তো মিসির চাচা?'

'হ্যাঁ মা, শরীর ভালো।'

তিনি সহজে কোনো মেয়েকে মা ডাকতে পারেন না। এই মেয়েটিকে মা ডেকে ভালো লাগছে। খানিকক্ষণের জন্যে হলেও ভুলে গেছেন যে তাঁর গলায় কাঁটা ফুটে আছে।

৩

বিশিষ্ট বেহালাবাদক শিল্পপতি ওসমান গনির মর্মান্তিক মৃত্যু [স্টাফ রিপোর্টার]

বিশিষ্ট বেহালাবাদক শিল্পপতি জনাব ওসমান গনি গত বারই জুন রাত তিনটায় গুলশানস্থ বাসভবনে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—জনাব ওসমান গনি ঐ রাতে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী নাদিয়া গনিকে কিছুক্ষণ বেহালা বাজিয়ে শোনান। অতঃপর তাঁকে বলেন বড় ধরনের দুঃসংবাদের জন্যে সবাইকে সবসময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। কন্যা এই পর্যায়ে জানতে চান, তিনি এ–জাতীয় কথা কেন বলছেন। ওসমান গনি তার উত্তরে নানান ধরনের রসিকতা করতে থাকেন, এবং এক সময় তাঁকে এক পট গরম কফি এনে দিতে বলেন। নাদিয়া গনি কফির পট নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখতে পান না। বাবা স্নান করছেন। বেরুতে দেরি হবে ভেবে তিনি আবার রান্নাঘরে ফিরে যান। নতুন এক পট কফি বানিয়ে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি বাথরুম থেকে আর্তস্বর শুনে চমকে ওঠেন। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সেখান থেকে শব্দ ভেসে আসছে। নাদিয়া গনি বাথরুমের দরজা খুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁর হৈচৈ শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসেন। বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেললে দেখা যায়, ওসমান গনির নিষ্প্রাণ দেহ বাথটাবের পানিতে ডুবে আছে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল তিনি আত্মহত্যা করেছেন, পরবর্তী সময়ে সুরতহাল রিপোর্টে বলা হয়—বাথটাবে স্নানরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দশ বছর আগে তাঁর স্ত্রীও দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নি। নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেন। প্রচারবিমুখ এই নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীর মৃত্যুতে নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্ববিশ্রুত বেহালাবাদক ইহুদি মেনহুইনের সঙ্গে তাঁর দু'টি অ্যালবাম আছে, যা প্রকাশ করেছে কলম্বিয়া রেকর্ডস। এই বরেণ্য শিল্পী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান করলেও নিজ দেশের বেতার টেলিভিশন বা কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে কখনোই বেহালা বাজাতে দেখা যায় নি।

মিসির আলি খবরটি মন দিয়ে পড়লেন। খবরের সঙ্গে ওসমান গনির একটি ছবি ছাপা হয়েছে। যুবক বয়সের ছবি। অত্যন্ত সুপুরুষ একজন মানুষ। বড়–বড় চোখ। সেই চোখে একধরনের বিষণ্নতা আছে। পরক্ষণেই মনে হল, ভদ্রলোকের চোখ দু'টি বিষণ্ন—এটা তাঁর মনগড়া অনুমান। মানুষটি একজন বেহালাবাদক এবং মৃত। সেই

কারণেই ছবিটি তিনি দেখছেন মমতা এবং বিষাদ নিয়ে। নিজের মমতা এবং বিষাদের কারণে ছবির চোখ দু'টি বিষাদমাখা বলে মনে হচ্ছে।

তিনি খবরটা আবার পড়লেন। তাঁর কাছে মনে হল, রিপোর্টার ওসমান গনির চরিত্রে একধরনের মহত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। এই শিল্পী নিজের দেশের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি—এটি তাঁর চরিত্রের কোনো বড় দিক নয়। তিনি যা করেছেন, তা হচ্ছে দেশের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। বড় মাপের শিল্পীরা এ-কাজ কখনো করবেন না। তা ছাড়া ভদ্রলোক শুধু শিল্পী নন, শিল্পপতি। অর্থাৎ তিনি শিল্পকে যেমন চিনেছেন, অর্থকেও তেমনি চিনেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নি—এই বাক্যটিতেও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। বরং এটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন অসহনীয় ছিল। যে-কারণে স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিবাহের যন্ত্রণায় যেতে চান নি।

মিসির আলি তৃতীয় বারের মতো রিপোর্টটি পড়লেন। তাঁর কাছে মনে হল রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ। কত বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু, তা দেওয়া নেই। জন্ম-তারিখ নেই। পুত্র-কন্যাদের কথা নেই। কার কাছে বেহালা বাজানো শিখেছেন, কতদিন ধরে বাজাচ্ছেন তাও নেই। বরং রিপোর্টটি অপ্রয়োজনীয় খবরে ঠাসা। তিনি কফি খেতে চাইলেন। মেয়ে তাঁর জন্যে কফি নিয়ে এল। পটভর্তি কফি। এটা না-লিখে রিপোর্টার ভদ্রলোক কন্যার কাছ থেকে জেনে নিতে পারতেন—তিনি তাঁর কন্যাকে কী বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে কোন রাগটি বাজানো হয়েছিল? নিশিরাতের কোনো রাগ, নাকি ভোরবেলার রাগ ভৈরবী?

রাত এগারটা বাজল। মিসির আলি যন্ত্রের মতো ঘুমুতে গেলেন। মনস্থির করলেন অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করবেন না। মাথা থেকে ওসমান গনিকে ঝেড়ে ফেলে ঘুমুতে যাবেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একটি মানুষ মারা গেছে, যাক না! কত লোক তো মারা যায়। আচ্ছা ভালো কথা, আমরা সবসময় বলি হৃদযন্ত্র। ফুসফুসকে ফুসফুসযন্ত্র বলি না। কিডনিকে কিডনিযন্ত্র বলি না। পত্রিকায় কখনো লেখা হয় নি "অমুক কিডনিযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।" আবেগ এবং অনুভূতির সঙ্গে যাকে এক করে দেখা হয়, সেই হৃৎপিণ্ডকে আমরা বলছি যন্ত্র। কোনো মানে হয় না।

রাত একটা বেজে গেল। মিসির আলির ঘুম এল না। মাথা ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকল। তাঁর ঘুমুনো প্রয়োজন। রাতজাগা তাঁর জন্যে একেবারেই নিষিদ্ধ। তিনি বিছানা থেকে নামলেন। দশ মিলিগ্রামের দু'টি ফ্রিজিয়াম খেলেন। মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে ঢুকলেন না। ঘরের দরজা খোলা রেখেই বাড়িওয়ালার সদর দরজায় কলিংবেল টিপলেন।

বেশিক্ষণ টিপতে হল না। বাড়িওয়ালা ওয়াদুদ সাহেব নিজেই উঠে এসে দরজা খুললেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'একটা টেলিফোন করব।'

'অবশ্যই অবশ্যই করবেন। কী হয়েছে বলুন তো? কারো অসুখবিসুখ?'

'জ্বি-না, অসুখবিসুখ না। একটা ব্যাপার নিয়ে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে আছে।

টেলিফোন না–করা পর্যন্ত মনে স্বস্তি পাব না। রাতে ঘুমুতে পারব না।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। একটা কেন, এক শ'টা টেলিফোন করুন। নাম্বার কী বলুন, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি।'

'নাম্বার জানি না। বের করতে হবে। ওসমান গনির কন্যা নাদিয়া গনির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কারা এরা?'

'আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'না।'

'তাহলে চিনবেন না। চেনার দরকার নেই। আমি কি আপনাকে ঘুম থেকে তুলেছি?'

'তা তুলেছেন। আমি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। এটা কোনো ব্যাপার না। আপনি তো আসেনই না। আপনার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগে। চা–টা কিছু খাবেন?

'খাব।'

রাত দুটোর সময় টেলিফোন পেয়ে কোনো তরুণী মধুর গলায় কথা বলবেন এটা আশা করা যায় না। কিন্তু মিসির আলিকে অবাক করে দিয়ে নাদিয়া গনি মিষ্টি গলায় বললেন, 'আপনি কে?'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনি এমনভাবে নাম বললেন, যেন নাম শুনলেই আমি আপনাকে চিনে ফেলব। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না।'

'পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন না। আমি কি কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। রাত দু'টার সময় যখন টেলিফোন করেছেন, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কারণে করেছেন। কী বলতে চান বলুন।'

মিসির আলি চট করে কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। আসলে টেলিফোনটি করা হয়েছে ঝোঁকের মাথায়। কী বলা হবে কিছুই ভাবা হয় নি।

নীরবতায় নাদিয়া গনি অধৈর্য হলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'টেলিফোনে কথা বলতে কি আপনার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে? আমি আপনাকে চিনি না। কখনো নাম শুনি নি। আপনার সঙ্গে আমার এমন কোনো কথা থাকতে পারে না যার জন্যে আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন।'

'অস্বস্তি বোধ করছি না। কী বলব গুছিয়ে উঠতে পারছি না।'

'তাহলে এক কাজ করুন—ভালোমতো গুছিয়ে একদিন টেলিফোন করুন। এবং দয়া করে রাত দু'টো–তিনটায় নয়। এই সময় টেলিফোনের জন্যে প্রশস্ত নয়।'

'আপনি কি টেলিফোন রেখে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণ যে ধরে রেখেছি তাই কি যথেষ্ট নয়? এই ভদ্রতাটুকু কি সবাই দেখায়?'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'না, দেখায় না। আর আপনি শুধু যে ভদ্রতার জন্যে টেলিফোন রিসিভার হাতে নিয়ে বসে আছেন তাও না। আমার ধারণা আপনি

যথেষ্ট কৌতূহল নিয়েই অপেক্ষা করছেন।'

'আপনার এ-রকম মনে করার কারণ কী?'

'মনে করার অনেকগুলি কারণ আছে। আপনি যে বললেন, আপনি আমাকে চেনেন না, কখনো আমার নাম শোনেন নি—তা ঠিক নয়। আপনার বাবার লেখার টেবিলে আমার একটা নোট পাওয়া গেছে। সেখানে তাঁকে সাবধান করা হয়েছে, যেন পানি থেকে দূরে থাকেন। শুধু এই কারণেই আপনার কাছে আমার নাম মনে থাকার কথা। তার ওপর পুলিশের কাছে আপনি অবশ্যই শুনেছেন যে, ওসমান গনি নাম নিয়ে একজন আমার কাছে গিয়েছিল। ঘটনাটা অদ্ভুত। গত চারদিন ধরে দিনরাত পুলিশ আমার বাসার দিকে লক্ষ রাখছে। এ-তথ্যও অবশ্যই আপনার জানা থাকার কথা। তার পরেও আপনি মিথ্যা করে বললেন, আপনি কখনো আমার নাম শোনেন নি।'

মিসির আলি দম নেবার জন্যে থামলেন। নাদিয়া গনি শীতল গলায় বললেন, 'আপনি এত দ্রুত কথা বলছেন কেন? আপনার সব কথা বুঝতে পারছি না। স্লোলি বলুন।'

মিসির আলি বললেন, 'গভীর রাতে টেলিফোনে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

নাদিয়া গনি হালকা গলায় বললেন, 'আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি আসুন, কথা বলব।'

'এখনই পাঠাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই। আপনি তো জেগেই আছেন। আসতে অসুবিধা আছে?'

'না, অসুবিধা নেই।'

নাদিয়া গনি হাসিমুখে বললেন, 'আসুন।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গি সহজ ও স্বাভাবিক। গভীর রাতে বাড়িতে অতিথি আসা যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রায়ই আসে। মেয়েটির পরনের শাড়ি খুব পরিপাটি। কিছুক্ষণ আগেই মুখ ধুয়ে হালকা ক্রীম গালে লাগানো হয়েছে। এত রাতেও চোখে-মুখে স্নিগ্ধ আভা। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি কোথাও নেই। চুল বেণী করা নয়, ছেড়ে দেওয়া। এত চুল মিসির আলি এর আগে কোনো মেয়ের মাথায় দেখেন নি। সবুজ রঙ সম্ভবত মেয়েটির প্রিয় রঙ। আজও সবুজ শাড়ি পরা। বয়স কত হবে? ২৫-এর মতো? হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। গান গাওয়া ছাড়া সে আর কী করে? পড়াশোনা কোন পর্যন্ত? মেয়েটি কি বিবাহিতা? অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছা করছে।

নাদিয়া তাঁকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। দোতলার বারান্দা সুন্দর করে সাজানো। মুখোমুখি গদিআঁটা বেতের চেয়ার বসানো। চেয়ার দু'টির মাঝখানে সাদা টেবিল-ক্লথে ঢাকা বেতের টেবিল। টেবিলে টী-কোজি ঢাকা টী-পট। একটা অ্যাশট্রে আছে। অ্যাশট্রের পাশে এক প্যাকেট সিগারেট, একটা দেয়াশলাই। কাচের ছোট্ট বাটিতে নানান ধরনের বাদামের মিশ্রণ। বারান্দা অন্ধকার। ঘরের ভেতর বাতি জ্বলছে। তার আলো এসে পড়েছে বারান্দায়।

'মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি।'

'ইচ্ছা করে বারান্দা অন্ধকার করে রেখেছি। অন্ধকারের আড়াল থাকলে কথা বলতে সুবিধা হয়।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কি এমন কথা আছে, যা বলার জন্যে অন্ধকারের আড়াল প্রয়োজন হবে?'

'না।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। মেয়েটিও মিসির আলিকে খানিকটা অবাক করে দিয়ে সিগারেট নিল। সিগারেট ধরাল আনাড়ি ভঙ্গিতে নয়, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

'আপনি কি আমার সিগারেট খাওয়া দেখে আবাক হচ্ছেন?'

'খানিকটা হয়েছি।'

'চা নিন। খুব ভালো চা। কীভাবে বানিয়েছি জানেন? সিক্সটি পারসেন্ট বাংলাদেশি চা, ফোর্টি পারসেন্ট দার্জিলিং টী। খুব সামান্য জাফরানও দেওয়া হয়েছে।'

মিসির আলি চা নিলেন। তাঁর কাছে আহামরি কিছু মনে হল না। চিনি কম হয়েছে। আরেকটু বেশি হলে ভালো হত। চিনি চাইতে ইচ্ছা করছে না। আশেপাশে কোনো কাজের লোক দেখা যাচ্ছে না। চিনি চাইলে হয়তো এ-মেয়েটিকেই উঠে যেতে হবে।

'মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি।'

'প্রথমেই আপনার কিছু ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। আপনার ধারণা হয়েছে, বাবার কাছে লেখা আপনার নোট আমি পড়েছি। এই ধারণা সত্যি নয়। বাবার মৃত্যু আমার জন্যে এত আপসেটিং ছিল যে আমাকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশ এসে তাঁর টেবিলের সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে। সেখানে কী লেখা বা কী লেখা না, আমি কিছুই জানি না। আপনার কাছে এক লোক গিয়ে বলেছে, সে ওসমান গনি। এই তথ্যও আমাকে বলা হয় নি। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো কিছু নিয়েই যেন আমাকে বিরক্ত না-করা হয়। তারা তা করছে না। বাবার সম্পর্কে আমি কারো সঙ্গেই কথা বলতে চাই না।'

'আপনি কিন্তু কথা বলেছেন। পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'তা বলেছি। এই লোক আপনার মতোই গভীর রাতে আমাকে টেলিফোন করেছিল। গভীর রাতে কেউ টেলিফোন করলে আমি সাধারণত কথা বলি।'

'কেন?'

'আপনি অনুমান করুন, আপনার ধারণা, আপনার অনুমানশক্তি প্রবল। পরীক্ষা হয়ে যাক।'

মিসির আলি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন যে আমার ধারণা, আমার অনুমানশক্তি প্রবল? আপনার কাছে এই দাবি আমি করি নি।'

'পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিনের সঙ্গে করেছেন। রাত দু'টায় আপনার টেলিফোন পাওয়ার পরপর আমি ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন সাহেবকে টেলিফোন করে আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চাই। তিনি আমাকে বলেছেন।'

'আমার সম্পর্কে কী তথ্য জানেন?'

'অনেক কিছুই জানি। আপনি যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তাও জানি। অসম্ভব জটিল কিছু সমস্যার আপনি সমাধান দিয়েছেন। আপনার আগ্রহের বিষয় হচ্ছে সাইকোলজি। অনেকের ধারণা, আপনি প্যারাসাইকোলজি বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। এখন আপনি বলুন দেখি, কেন আমি রাতের টেলিফোন অ্যাটেন্ড করি? কেনই–বা গভীর রাতে আপনাকে আসতে বললাম?'

'সত্যি জানতে চান?'

'হ্যাঁ, জানতে চাই।'

'আপনার ভয়াবহ ধরনের ইনসমনিয়া আছে। রাতের পর রাত আপনি জেগে থাকেন। এই সময় আপনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন এবং আমার ধারণা খানিকটা ভয়ও পান। রাতে কেউ টেলিফোন করলে আপনার এ–কারণেই ভালো লাগে। কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগে। আপনার শুচিবাইর মতো আছে। রাতে কয়েকবার আপনি গোসল করেন। কিছুক্ষণ আগে গোসল সেরেছেন। এখনো চুল শুকায় নি। আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনি আরো নিঃসঙ্গ হয়েছেন। কারণ তাঁরও ইনসমনিয়া ছিল। তিনিও রাত জাগতেন। দু' জন সঙ্গ দিতেন দু' জনকে।'

'কী করে বুঝলেন, বাবার ইনসমনিয়া ছিল?'

'পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী। বেহালা বাজানো শোনার পর আপনি বাবার জন্যে কফি আনতে গেলেন। অর্থাৎ আপনারা আরো রাত জাগবেন। নয়তো পট– ভর্তি করে কফি আনতেন না। আপনার বাবারও গভীর রাতে স্নানের অভ্যাস ছিল। কারণ আপনি কফি নিয়ে এসে দেখেন—বাথরুমের দরজা বন্ধ। শাওয়ার দিয়ে পানি পড়ছে। আপনি ধরে নেন আপনার বাবার বেরুতে দেরি হবে। কাজেই কফির পট নিয়ে ফিরে যান, এবং আবারো নতুন করে কফি বানান। বাবার গভীর রাতে স্নান আপনার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কারণ আপনার বাবার এই অভ্যাসের সঙ্গে আপনি পরিচিত।'

নাদিয়া আরেকটি সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চান? বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'কী জানতে চান?'

'আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। তবে সবার আগে জানতে চাই—আপনার কি ধারণা, আপনার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে?'

'ডাক্তাররা তাই বলছেন।'

'আপনার কী ধারণা?'

নাদিয়া আধ–খাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা বাবা আত্মহত্যা করেছেন। কেন করেছেন তা–ও আমি জানি। আমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহও বাথরুমের বাথটাবে পাওয়া যায়। মা বিখ্যাত কেউ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পত্রিকায় আসে নি।'

'তিনি কত বছর আগে মারা যান?'

'জুন মাসের ২১ তারিখে ন' বছর আগে।'

'আপনার বাবার ইনসমনিয়া কি আপনার মা'র মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়েছে?'

'না, আগেও ছিল। তবে মা'র মৃত্যুর পর বেড়েছে।'

'আপনি কি চান আমি আপনার বাবার মৃত্যুসংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করি?'

'আমি চাই না। কী ঘটছে আমি জানি। আমি খুব ভালো করে জানি। আমার বুদ্ধি অন্যের চেয়ে কম বা আপনার চেয়ে কম, তা মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আমি তা মনে করছি না।'

নাদিয়া হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। হাই তুলতে-তুলতে বললেন, 'চারটা কুড়ি বাজে। এই সময় আমি ঘুমুতে যাই। গাড়ি তৈরি আছে, আপনাকে পৌঁছে দেবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লেগেছে। তবে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। কোনোদিনই না। দয়া করে আর কখনো আসবেন না এবং কখনো আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

মিসির আলি উঠতে-উঠতে বললেন, 'আপনার এমন কোনো আত্মীয়স্বজন কি আছে, যার তিনটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

নাদিয়া গলার স্বর একটু তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো কেউ কি এসে আপনাকে বলেছিল—আমি ওসমান গনি?'

'জ্বি।'

'সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো এমন কাউকে আমি চিনি না। আমার ধারণা, বাবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। বাবার মধ্যে একধরনের অভিনয় প্রবণতা ছিল। আমি যখন খুব ছোট, তখন একবার তিনি রাক্ষস সেজে আমাদের ভয় দেখিয়ে- ছিলেন। এই রকম কিছু হবে। সব মানুষের মধ্যেই কিছু পরিমাণ ইনসেনিটি থাকে।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি।'

'পুলিশের লোক কি এখনো আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে?'

'থাকে।'

'আর যেন না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করব। আসুন, আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে মিসির আলি বললেন, 'শেষবার বেহালায় আপনার বাবা কী বাজিয়েছিলেন—অর্থাৎ কোন রাগ?'

'উনি একটা ঘুমপাড়ানি গানের সুর বাজিয়েছিলেন—ওঁর নিজের খুব প্রিয় সুর, আমারো প্রিয়–একটি চেক লোকগীতির সুরে লালাবাই। লাইনগুলি হচ্ছে–

"Precious baby, Sweetly sleep
Sleep in peace
Sleep in comfort, slumber deep.
I will rock you, rock you, rock you
I will rock you, rock you, rock you."

বলতে-বলতে নাদিয়ার চোখ ভিজে উঠল। মিসির আলি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। আপনি পড়াশোনা কতদূর করেছেন?' নাদিয়া বললেন 'আমি আপনার আর কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেব না।'

৪

'এটা কি অম্বিকাবাবুর বাড়ি?'

দরজা ধরে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, সে জবাব দিল না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির বয়স উনিশ-কুড়ি। হালকা-পাতলা গড়নের শ্যামলা মেয়ে। চোখ দু'টি অপূর্ব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার চোখ নয়। কিন্তু মেয়েটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আমার খুব প্রয়োজন। আমার নাম মিসির আলি।'

'আমি আপনাকে চিনি।'

'তাই বুঝি? তাহলে তো ভালোই হল। লোকজন আমাকে চিনতে শুরু করেছে এটাই সমস্যা। তোমার নাম কি?'

'অতসী।'

'অতসী, তোমার বাবা কি আছেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি নিশ্চিত হলেন অম্বিকাবাবু বাড়িতেই আছেন। তবে অতসী হয়তো তা স্বীকার করবে না। মিথ্যা করে বলবে, বাবা বাড়ি নেই। তবে মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে মিথ্যা বলার অভ্যাস এখনো হয় নি। মিথ্যা বলার আগে তাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। মিসির আলি মেয়েটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। হাসিমুখে বললেন, 'উনি বোধহয় বাড়ি নেই

অতসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'জ্বি-না, নেই।'

'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কখন এলে তাঁকে পাওয়া যাবে বল তো?'

মিসির আলি আবার মেয়েটিকে বিপদে ফেললেন। এখন অতসীকে বাধ্য হয়ে সময় দিতে হবে। কিংবা বলতে হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। এই দু'টির কোনটি সে বলবে কে জানে।

মিসির আলি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা না করলেও অবশ্যি চলে। তোমার সঙ্গে কথা বললেও হয়। আমি বরং তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে চলে যাই।'

অতসী চমকে উঠে বলল, 'আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কী কথা?'

'তুমি কথা বলতে না চাইলে বলতে হবে না।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে আসারও প্রয়োজন দেখছি না। এখানে দাঁড়িয়েই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাই। জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'অম্বিকাবাবুর তিনটি দাঁত কি সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

অতসী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। এবার সে তাকাল ভীত চোখে। তার চোখের পাতা দ্রুত কাঁপছে। নাকের পাটায় ঘাম জমছে। চোখে-চোখেও তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন আর নেই।

'অতসী।'

অতসী তাকাল। কিছু বলল না।

'শোন মেয়ে, তোমার বাবা এক রাতে আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর নাম ওসমান গনি। তিনি অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের অভিনয় করলেন। বেশ ভালো অভিনয়। আমি ধরতে পারলাম না।'

'বাবা কি আপনাকে এ-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন?'

'না।'

'তাহলে ওনাকে খুঁজে বের করলেন কীভাবে?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'তুমি একটু আগে বলেছ, তুমি আমার নাম জান। নাম যদি জান, তাহলে এটাও জানা উচিত যে, মানুষ খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। কী করে বের করেছি জানতে চাও?'

অতসী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'তাহলে শোন। তোমার বাবা বলেছিলেন তাঁর ডায়াবেটিস। এই অংশটি অভিনয় নয়। কারণ তিনি চিনি ছাড়া চা খেতে চাইলেন। একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, যে ঢাকায় থাকে, সে চিকিৎসার জন্যে ডায়াবেটিক সেন্টারে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমি গেলাম বারডেমে, জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের এমন কোনো রুগী আছে কি না, যার তিনটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তারা সঙ্গে-সঙ্গে বলল—অম্বিকাবাবু। সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো না থাকলে খুঁজে বের করতে আরেকটু সময় লাগত।'

অতসী তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে বিস্মিত হয়েছে কি না। মিসির আলি চাচ্ছেন মেয়েটি বিস্মিত হোক। কারণ মেয়েটিকে বিস্ময়ে অভিভূত করা তাঁর নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। সে বিস্ময়ে অভিভূত হলেই তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দেবে। আগ্রহ করে দেবে।

'অতসী।'

'জ্বি।'

'তোমার বাবা যে বাড়িতেই আছেন তা আমি জানি। যদিও বুঝতে পারছি না, কেন তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিচ্ছ না।'

'আমার বাবা অসুস্থ।'

'ও।'

'বিশ্বাস করুন তিনি অসুস্থ।'

'বিশ্বাস করছি।'

'আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন?'

'তুমি দরজা থেকে হাত নামালেই ঘরে ঢুকব। আজ সারাদিন খুব ছোটাছুটি করেছি। চা খাওয়া হয় নি। তুমি কি চা খাওয়াবে?'

'আপনি দুধ ছাড়া চা যদি খেতে পারেন, তাহলে খাওয়াব। ঘরে দুধ নেই।'

'চা দুধ ছাড়া খাওয়াই ভালো।'

অতসী দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। মিসির আলি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। হতদরিদ্র অবস্থা। এই ঘরটি নিশ্চয়ই এদের বসার ঘর। দু'টা বেতের চেয়ার। অনেক জায়গায় বেত খুলে গেছে। তার দিয়ে মেরামত করা। ঘরের প্রায় পুরোটা জুড়ে বড় একটা চৌকি। চৌকিতে পাটি পাতা। সেই পাটিও দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ। পাটির পাশে হাতপাখা—যদিও একটি সিলিং ফ্যান দেখা যাচ্ছে। মাকড়সা জাল বানিয়েছে

ফ্যানের পাখায়—অর্থাৎ ফ্যানটি অনেকদিন ঘুরছে না।

মিসির আলি মনস্থির করতে পারলেন না কোথায় বসবেন। পাটিতে বসবেন না বেতের চেয়ারে বসবেন। পাটিতে বসাই ঠিক করলেন। এখান থেকে বাড়ির ভেতরের খানিকটা দেখা যায়।

মেয়েটি চা বসিয়েছে বারান্দায়। এদের রান্নাঘর সম্ভবত বারান্দায়। দু'–কামরার বাড়ি। ভেতরের ঘরে নিশ্চয়ই মেয়েটি ঘুমায়। বসার ঘরে থাকেন অম্বিকাবাবু। ভদ্রলোকের পেশা কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। চটপটে ধরনের কথাবার্তা এবং গল্প তৈরি করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার ক্ষমতা থেকে দু' ধরনের সম্ভাবনার কথা মনে হয় ঃ

(১) ভদ্রলোকের পেশা দালালি করা।

(২) ভদ্রলোক একজন জ্যোতিষী।

জ্যোতিষী হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তাঁর হাতে তিনটি পাথরের আঙটি। তবে জ্যোতিষীরা ঘরে নানান নিদর্শন ছড়িয়ে রাখবে, রাস্তায় সাইনবোর্ড থাকবে—

"জ্যোতিষসম্রাট অম্বিকাচরণ
কর গণনা ও কোষ্ঠী বিচার করা হয়।"

অতসী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। মৃদু গলায় বলল, 'চা নিন।'

মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন।

অতসী ক্ষীণ গলায় বলল, 'ঘরে চিনিও নেই। চিনি ছাড়া চা। আপনি কিছু মনে করবেন না। বাবা চায়ে চিনি খান না, কাজেই চিনি কেনা হয় না।'

'অতসী, তুমি বস।'

অতসী বেতের চেয়ারে বসল। মিসির আলি বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিনি ছাড়া চা দিয়ে তুমি মন–খারাপ করেছ। মন–খারাপ করার কিছু নেই। আমি চায়ে দুধ খাই, চিনি খাই না।'

মেয়েটি কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তুমি আর তোমার বাবা, তোমরা দু' জন এখানে থাক?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা ক' ভাই–বোন?'

'আমি একা।'

'তোমার মা জীবিত নেই?'

'না।'

'কতদিন আগে মারা গেছেন?'

'ষোল–সতর বছর আগে।'

'কি করেন তোমার বাবা?'

'তিনি নবীনগর গার্লস স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। আগে প্রাইভেট পড়াতেন। এখন আর পড়ান না। অসুস্থ।'

'কতদিন ধরে অসুস্থ?'

'বছর দুই।'

'খুব অপ্রিয় একটা প্রশ্ন করছি অতসী, তোমাদের চলে কীভাবে?'

অতসী জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমার বাবা একজন জ্যোতিষী। তিনি যে স্কুল-শিক্ষক বুঝতে পারি নি।'

অতসী যন্ত্রের মতো গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। বাবা মাস্টারির পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চা করতেন।'

'করতেন বলছ কেন? এখন করেন না?'

'না।'

'শখের চর্চা?'

'শখের চর্চা না। তিনি টাকা নিতেন।'

'ও আচ্ছা। তাঁর রোজগার কেমন ছিল?'

'তাঁর রোজগার ভালোই ছিল। তিনি রোজগার যেমন করতেন খরচও তেমন করতেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর হাতের আঙটি তিনটি লক্ষ করেছেন। একটি আঙটি হচ্ছে নীলার। বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়ার কথা।'

'বিক্রি করছ না কেন? আমার মনে হচ্ছে বিক্রি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

অতসী জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'কাগজ-কলম আন তো। আমি আমার বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তোমার বাবা সুস্থ হলে আমাকে খবর দিও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। হাতটাও না-হয় দেখাব।'

'আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?'

'না, করি না। অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

'তাহলে বাবাকে হাত দেখাতে চাচ্ছেন কেন?'

'কৌতূহল, আর কিছুই না। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ যদি বলে আমার বাসায় একটা পোষা ভূত আছে, দড়ি দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখি-তাহলে আমি অবশ্যই ঐ ভূত দেখতে যাব।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। অতসী তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। মিসির আলি বললেন, 'যাই।' মেয়েটি কিছুই বলল না।

রাস্তায় নেমে মিসির আলি পিছন ফিরে তাকালেন। অতসী এখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। একটা বিশেষ জরুরি কথাই মিসির আলি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন, ওসমান গনিকে মেয়েটি চেনে কি না। তিনি ফিরে এলেন। মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও যেন জানে—মিসির আলি ফিরে আসবেন।

'অতসী।'

'জ্বি।'

'তুমি কি ওসমান গনি সাহেবকে চেন?'

অতসী চুপ করে রইল। মিসির আলি জবাবের জন্যে মিনিট দুই অপেক্ষা করলেন। আর অপেক্ষা করার অর্থ হয় না। মেয়েটি মুখ খুলবে না।

'অতসী।'

'বলুন।'

'আমার ঠিকানাটা হারাবে না। যত্ন করে রেখ। আমি অপেক্ষা করব তোমাদের জন্যে। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।'

ঠিক তখন বাড়ির ভেতর থেকে পশুর গর্জনের মতো গর্জন শোনা গেল। কেউ মনে হয় ভারি কিছু ছুঁড়ে ফেলল।

মিসির আলি বললেন, 'তোমার বাবাকে কি তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে?' অতসী হ্যাঁ, না কিছুই বলল না।

মেয়েটি স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। সে একবারও চোখের পলক ফেলল না। মিসির আলি পথে নামতে-নামতে ভাবতে লাগলেন, মানুষ সেকেন্ডে ক'বার চোখের পলক ফেলে? চোখের পলক ফেলা দিয়ে মানুষের চরিত্র কি বিচার করা যায়? যেমন সেকেন্ডে ৫ বারের বেশি যে চোখের পলক ফেলবে সে হবে রাগী। যে ৩ বারের কম ফেলবে সে হবে ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। কেউ কি চেষ্টা করেছে?

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কেউ মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে এল না। আর বোধহয় আসবে না। আসবার হলে প্রথম দু'-তিন দিনের ভেতরই আসত। অষ্টম দিনে মিসির আলি নিজেই গেলেন। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়ার পর বাচ্চা একটা ছেলে দরজা খুলল। মিসির আলি বললেন, 'অতসী আছে?'

ছেলেটা হাসিমুখে বলল, 'আমরা নতুন ভাড়াটে। তারা চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে, জান?'

'না।'

'আচ্ছা।'

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মিসির আলি কেন জানি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। বড় ধরনের ঝামেলা মাথার ওপর থেকে নেমে গেলে যে-ধরনের স্বস্তিবোধ হয়, সে-ধরনের স্বস্তি। শরীরটা খারাপ হবার পর থেকে তাঁর ভেতর একধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। চাপ সহ্য করতে পারেন না। ওসমান গনি-অম্বিকাচরণ এই দু' জনের ব্যাপারটা তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে চাপ থেকে মুক্তি পেলেন। আর ভাবতে হবে না। আশি লাখ লোকের বাস এই শহরে। আশি লাখ লোকের ভেতর কেউ যদি হারিয়ে যেতে চায়, তাকে খুঁজে বের করা মুশকিল। আর দরকারই-বা কি?

মিসির আলি রিকশা নিলেন। হালকাভাবে বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াশার মতো বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে ঘরের দিকে রওনা হয়েছেন। তাঁর ভালো লাগছে। বৃষ্টি বাড়ছে, কিন্তু তাঁর হুড তুলতে কিংবা প্লাস্টিকের পর্দায় শরীর ঢাকতে ভালো লাগছে না। রাস্তায় লোকজন আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখছে—একটা মানুষ রিকশায় বসে ভিজতে-ভিজতে এগুচ্ছে। রিকশাওয়ালা ধমকের স্বরে বলল, 'হুড তুলেন। ভিজতেছেন ক্যান?' মিসির আলি জবাব দিলেন না। রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে রিকশা থামিয়ে বিরক্ত মুখে হুড তুলতে লাগল। হুড থাকা সত্ত্বেও একটা মানুষ তার রিকশায় ভিজতে-ভিজতে যাবে এটা তার সহ্য হচ্ছে না। সে হয়তো সূক্ষ্মভাবে অপমানিত বোধ করছে।

রিকশা আবার চলতে শুরু করল। মিসির আলি ভাবতে শুরু করলেন, কি করে এই অম্বিকাচরণবাবুকে খুঁজে বের করা যায়। কাজটা কি খুব জটিল? তাঁর কাছে মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক যে-বাড়িতে ছিলেন সে-বাড়ির মালিক জানতে পারে। নতুন বাড়ির

ঠিক ঠিকানা না পারলেও, কোন এলাকায় গিয়েছেন তা বলতে পারার কথা। আশেপাশের মুদির দোকানগুলি খুঁজতে হবে। নিশ্চয় আগে যেখানে ছিলেন তার আশেপাশের মুদির দোকানে তাঁর বাকির খাতা আছে। বাকির সব টাকা দিতে না পারলে দোকানদারকে নতুন বাসার ঠিকানা বলে যাবেন, এটাই সঙ্গত। সবচেয়ে বড় সাহায্য পাওয়া যাবে বিটের পিওনদের কাছ থেকে। এরা বলতে পারবে, তবে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

'রিকশাওয়ালা।'

'জ্বে?'

'আপনার নাম কি ভাই?'

'কেরামত।'

'শুনুন ভাই কেরামত, আপনি আমাকে যেখান থেকে এনেছিলেন ঠিক সেইখানে নামিয়ে দিয়ে আসুন। আর হুডটা ফেলে দিন। আমার বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে যেতে ভালো লাগছে।'

রিকশাওয়ালা রিকশা থামাল। সে অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। মিসির আলি লক্ষ করেছেন, রিকশাওয়ালাদের মধ্যে এই একটা ব্যাপার আছে, তারা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে, কখনো সেখানে যেতে চায় না। হয়তো কোনো এক কুসংস্কার তাদের মধ্যেও আছে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু সেখানে ফিরে আসা যাবে না। ফিরে এলে চক্র সম্পূর্ণ হয়। মানুষ কখনো চক্র সম্পূর্ণ করতে চায় না। সে চক্র ভাঙতে চায়, কিন্তু প্রকৃতি নামক অজানা অচেনা একটা কিছু বারবার মানুষের চক্র সম্পূর্ণ করে দেয়। কেন করে?

তুমুল বর্ষণ হচ্ছে।

মিসির আলি ভিজছেন। ভালো লাগছে। তাঁর খুব ভালো লাগছে।

৫

বৃষ্টিতে ভেজার জন্যেই হয়তো তাঁর জ্বর এসে গেল। বেশ জ্বর। তবে আরামদায়ক জ্বর। একধরনের জ্বরে শারীরিক কষ্ট প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আরেক ধরনের জ্বরে শরীরে ভোঁতা ভাব চলে আসে। অনুভূতির তীক্ষ্ণতা থাকে না। গরম কম্বলের ভেতর ঢুকে আরাম করতে ভালো লাগে। ক্ষুধা নামক শারীরিক যন্ত্রণার হাত থেকেও সাময়িক ত্রাণ পাওয়া যায়। কারণ এ-জাতীয় জ্বরে ক্ষুধাবোধ থাকে না।

রাত এগারটা। বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাবার নির্ধারিত সময়। মিসির আলি নিয়ম ভঙ্গ করলেন। বিছানায় যাবার পরিবর্তে খাতা হাতে বসার ঘরে ঢুকলেন। গত কয়েকদিন ধরেই ওসমান গনি সম্পর্কে কিছু-কিছু নোট করেছেন। নোটগুলি পড়া দরকার। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, তাঁর উচিত বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাওয়া। তিনি নিশ্চিত জানেন ঘুম আসবে না। গত দু' রাত তা-ই হয়েছে। প্রায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন। তার চেয়ে খাতা নিয়ে বসে থাকা ভালো। পড়তে-পড়তে একসময় হয়তো সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়বেন। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা বোধহয় তাঁর ভাগ্যে নেই। মিসির আলি

পড়তে শুরু করলেন—

ওসমান গনি

ওসমান গনিকে আমি দেখি নি। কোটিপতি মানুষ। একজন বেহালাবাদক। যারা জন্ম থেকেই কোটিপতি এবং যারা পরবর্তী সময়ে কোটিপতি হয় তাদের প্রকৃতি ভিন্ন হয়। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে যারা কোটিপতির পর্যায়ে আসে, তাদেরকে এক জীবনে দু' রকম সমস্যায় পড়তে হয়। অর্থকষ্টের সমস্যা এবং প্রচুর অর্থ দিয়ে কী করা যায় সেই সমস্যা। ওসমান গনির ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। যাদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে, তাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে হলেও ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। সাধারণ মানুষদের বেলায় তার চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া সম্ভব বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে সে কী করবে। রেগে যাবে, আনন্দিত হবে, না দুঃখিত হবে। হলেও কী পরিমাণ হবে। কিন্তু ওসমান গনি জাতীয় মানুষ, যাঁরা দু'টি ধাপ অতিক্রম করেছেন—তাঁদের ক্ষেত্রে আগেভাগে কিছু বলা সম্ভব না। চরিত্রে প্রেডিক্‌টিবিলিটি বলে কিছু তাঁদের থাকে না।

ওসমান গনি সম্পর্কে ডাক্তার এবং পুলিশ বলছে—স্বাভাবিক মৃত্যু। তার কন্যা বলছে আত্মহত্যা। তাঁর কন্যার বক্তব্যই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এ-জাতীয় চরিত্রের মানুষদের কাছে জীবন একসময় অসহনীয় হয়ে ওঠে। তারা একসময় ভাবতে শুরু করে, এ-জীবনে যা পাবার ছিল, সব পাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছুই পাওয়ার নেই। আত্মহননের পথই তখন সহজ-স্বাভাবিক পথ বলে মনে হয়।

এ-পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটায় কোনো জটিলতা নেই। জটিলতা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম অম্বিকাবাবু। অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি। তিনি নতুন এক আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছেন। সেই আস্তানা আমি খুঁজে বের করেছি। যদিও এখনো ঠিক করি নি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি দেখা করব কি করব না।

অম্বিকাবাবুর কন্যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কন্যার বক্তব্য অনুযায়ী তার বাবা অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। 'অসুস্থ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে না-দেওয়া' মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অসুস্থ মানুষদের সঙ্গেই বরং বেশি করে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুপথযাত্রী, যার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, তাকেও দল বেঁধে লোকজন দেখতে আসবে এবং জিজ্ঞেস করবে, "এখন শরীরটা কেমন?"

তবে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় একধরনের অসুস্থ রুগী আছে, যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা হচ্ছে মানসিক রুগী। শরীরের রোগ আমরা দেখাতে ভালবাসি কিন্তু মনের রোগ নয়। এই রোগ সম্পর্কে কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না।

পশুর মতো অম্বিকাবাবুকে গর্জন করতে আমি শুনেছি, তবে তা অভিনয়ও হতে পারে।

তার পরেও অম্বিকাবাবু যে একজন মানসিক রুগী তা ধরে নেওয়া যায়। মেয়ের কথানুযায়ী তিনি অনেকদিন থেকেই অসুখে ভুগছেন। একজন মানসিক রুগী আমাকে দিয়ে একটি চিরকুট লিখিয়ে নিল। যে- সাবধানবাণী সেই চিরকুটে লেখা তা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। কাকতালীয় ব্যাপার বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমার ধারণা, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আমাকে সমস্যাটির সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। ওসমান গনি নিজে এই কাজটি করতে পারেন, যাতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে একধরনের রহস্য তৈরি হয়। কিন্তু তিনি তা করবেন বলে মনে হয় না। একজন অসম্ভব ধনবান ব্যক্তি, যিনি নিজের ভুবন নিয়ে ব্যস্ত, তিনি আমাকে চিনবেন তা আশা করা ঠিক না। তা ছাড়া ভদ্রলোক নিভৃতচারী। তার চেয়েও বড়ো যুক্তি, আমার নোটটি পেয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু হোম মিনিস্টারকে টেলিফোন করেছিলেন।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

এই কি দাঁড়াচ্ছে না, যে, ওসমান গনির সমস্যার সঙ্গে আমাকে জড়িয়েছেন অম্বিকাচরণ। তাঁর উদ্দেশ্য কি ওসমান গনিকে সাবধান করা? এই কাজটি তো তিনি আমাকে না-জড়িয়ে করতে পারতেন। আমাকে জড়ালেন কেন?

লেখা এই পর্যন্তই। মিসির আলি হাই তুললেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়লে হয়তো ঘুম এসে যাবে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে রাতের শেষ সিগারেটটি খেলেন এবং তাঁর খাতায় পেনসিল দিয়ে লিখলেন,

"ওসমান গনির মৃত্যু একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আমার ধারণা এই হত্যাকাণ্ডের নায়িকা তাঁর কন্যা নাদিয়া গনি। ওসমান গনির স্ত্রীর মৃত্যু এই মেয়েটির হাতেই হয়েছে।"

মিসির আলি অবাক হয়ে নিজের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুট করে এই কথাগুলি কেন লিখলেন নিজেই জানেন না। হয়তো তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। তাঁর হাতে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। তবু তাঁর মন বলছে, এই হচ্ছে ঘটনা। অম্বিকাচারণ বলে এক ভদ্রলোক ঘটনা জানেন। তিনি সাহায্য প্রার্থনা করছেন মিসির আলি নামের একজনের কাছে।

মিসির আলি ঘুমুতে গেলেন রাত একটার দিকে। অনেক দিন পর তাঁর সুনিদ্রা হল।

৬

হোম মিনিস্টারের দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ডাক্তারের চেম্বারের রুগীরা যেমন চাপা অশান্তি নিয়ে অপেক্ষা করে—সবার অপেক্ষার ধরন সে-রকম। কারণ মিনিস্টার সাহেব সবার সঙ্গে দেখা করছেন না। মিনিস্টারের পি. এ. যে-ই আসছে তার নাম-ধাম এবং সাক্ষাতের কারণ লিখে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলছে, আজ মিনিস্টার সাহেব একটা ক্যাবিনেট মীটিং-এ যাবেন। আজ দেখা হবে না। অন্য আরেক দিন আসুন। এর মধ্যেও আবার কাউকে-কাউকে বসতে বলছে। সরাসরি বলে দিলেই হয়—আপনার সঙ্গে মিনিস্টার সাহেব দেখা করবেন, আপনার সঙ্গে করবেন না।

মিসির আলি সাক্ষাতের কারণের জায়গায় প্রথমে লিখেছিলেন ব্যক্তিগত। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে সাক্ষাতের কারণ ব্যক্তিগত নয়। তিনি এসেছেন ওসমান গনি প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যে। এটা কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত নয়। কাজেই "ব্যক্তিগত" শব্দটি কেটে তার নিচে লিখলেন—"ওসমান গনি প্রসঙ্গ"। লেখার পর মনে হল, এই ওসমান গনি যে সেই ওসমান গনি তা কি মিনিস্টার সাহেব বুঝতে পারবেন? ওসমান গনি নামের আগে লেখা উচিত ছিল, বেহালাবাদক এবং শিল্পপতি ওসমান গনি। তাহলে আবার নতুন করে লিখতে হয়। পি. এ. ভদ্রলোক যদিও মাই ডিয়ার ধরনের মানুষ, তবু তাঁর ধৈর্যেরও তো সীমা আছে।

মিসির আলি অন্যদের মতো অপেক্ষা করছেন। মিনিস্টার সাহেব ভেতরে ডেকে নেবার ব্যাপারে কী পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। 'আগে এলে আগে যাবে' এই পদ্ধতি নয়। অন্য কোনো পদ্ধতি কাজ করছে। যে- পদ্ধতিই হোক, সেই পদ্ধতিতে মিসির আলির নাম বোধহয় সবার শেষে। সবারই ডাক পড়ছে, শুধু মিসির আলির ডাক পড়ছে না। একটা বেজে গেছে। মিনিস্টার সাহেব নিশ্চয়ই দুপুরের খাবার

খেতে যাবেন।

ঠিক একটা বাজতেই পি· এ· এসে বলল, 'আপনারা যাঁরা বাকি আছেন তাঁরা আগামী বুধবার আসুন। স্যার এখন লাঞ্চ ব্রেক নেবেন। তিনটায় স্যারের ক্যাবিনেট মীটিং আছে।' মিসির আলি অন্যদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। পি· এ· তাঁর কাছে এসে বলল, 'স্যার, আপনি বসুন। স্যার আপনাকে বসতে বলেছেন।'

'কতক্ষণ বসব?'

'তা তো স্যার বলতে পারছি না। চা খান, চা দিতে বলি।'

'বলুন।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই দুপুরে নিশ্চয়ই শুধু চা দেবে না। ভর–দুপুরে খালিপেটে চা খাওয়া ঠিক না, তা মিনিস্টার সাহেবের পি· এ· নিশ্চয়ই জানেন।

চা আসার আগেই মিসির আলির ডাক পড়ল। হোম মিনিস্টার ছদরুদ্দিন হাসিমুখে বললেন, 'আসুন ভাই, ভাত খেতে–খেতে কথা বলি।'

এটা শুধু যে ভদ্রতার কথা তা নয়, মিসির আলি লক্ষ করলেন, টেবিলে দু'টা থালা সাজানো। মিনিস্টার সাহেব নিজেই টিফিন ক্যারিয়ার খুলছেন।

'মিসির আলি সাহেব, বাথরুম থেকে হাত–মুখ ধুয়ে আসতে পারেন। সাবান, তেল, গামছা সব আছে। ইচ্ছা করলে গোসল সেরে ফেলতে পারেন। হা হা হা।'

'আপনি কি আমাকে সত্যি–সত্যি আপনার সঙ্গে খেতে বলছেন?'

'অবশ্যই।'

'এতটা ভদ্রতা কেন দেখাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

'মিনিস্টার হলেই অভদ্র হতে হবে এমন কোনো কথা কি আছে?'

'না, তা নেই। সব সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আপনি নিশ্চয়ই দুপুরে আপনার সঙ্গে খেতে বলেন না?'

'না, সবাইকে বলি না। তবে একজনকে সবসময় বলি। আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি একা খেতে পারি না। খাবার সময় কথা না বললে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। এই জন্যে যারা দেখা করতে আসে তাদের মাঝ থেকে একজনকে ঠিক করে রাখি, যার সঙ্গে ভাত খাব।'

'সেটা কীভাবে ঠিক করেন? অ্যালফাবেটিকেলি?'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, খেতে বলেছি খাবেন। এত কথা কেন?'

মিসির আলি খেতে বসলেন। আয়োজন অতি সামান্য। পটল ভাজি, টেংরা মাছের ঝোল, ডাল। ভাতের চালগুলিও মোটা–মোটা। ইরি হবারই সম্ভবনা।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'খেতে পারছেন তো?'

'পারছি।

'খাবারের মান ভালো না। কী করব বলুন—মিনিস্টার হিসেবে যা পাই তাতে এর চেয়ে ভালো খাওয়া সম্ভব না। অধিকাংশ লোকের ধারণা, আমরা রাজার হালে থাকি।'

'আপনি হয়তো থাকেন না, অনেকেই থাকে।

'তাও ঠিক। সব পাখি মাছ খায়, দোষ হয় মাছরাঙার। আমরা হলাম মাছরাঙা পাখি। এখন বলুন, কি জন্যে এসেছেন আমার কাছে?'

'ওসমান গনি প্রসঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'বলুন।'

'আমার কথা আপনি কতটুক গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সেটা ভেবেই কথা বলতে সংকোচ বোধ করছি।'

'সংকোচ বোধ করবেন না, বলুন। আপনার কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। আপনি কে আমি জানি। আপনার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও জানি। আমার জানামতে পুলিশের কিছু জটিল মামলায় আপনি সাহায্য করেছেন। আমার আগে যিনি হোম মিনিস্টার ছিলেন তিনি আপনার প্রসঙ্গে একটা নোটও রেখে গেছেন। ওলিয়ুর রহমান সাহেব—চেনেন তাঁকে?'

'জ্বি, চিনি।'

'কীভাবে চেনেন?'

'একটা খুনের মামলার ব্যাপারে উনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি সাহায্য করেছিলাম।'

'এখন আপনার বক্তব্য বলুন—'

'ওসমান গনির মৃত্যুরহস্য সমাধানে আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই।'

'বাক্যটা আবার বলুন। ভালোমতো শুনি নি।'

মিসির আলি বাক্যটি দ্বিতীয় বার বললেন। হোম মিনিস্টার খাওয়া বন্ধ রেখে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। যখন কথা বললেন তখন তাঁর গলার স্বরে বিরক্তি চাপা রইল না—

'ওসমান গনির মৃত্যুতে কোনো রহস্য নেই। কাজেই আপনি কী ধরনের সমাধানের কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। ডাক্তারদের তাই ধারণা। ডাক্তারদের ডেথ সার্টিফিকেটে এ-কথা পরিষ্কার লেখা আছে।'

'আমার ধারণা এটা হত্যাকাণ্ড।'

'একটা হাস্যকর ধারণা করার তো কোনো অর্থ হয় না।'

'আপনার মনে হচ্ছে ধারণাটা হাস্যকর?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। শুধু আমার না, অনেকেরই মনে হবে। যাদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত উর্বর তাদের কথা অবশ্যি ভিন্ন। আপনি যদি বলতেন এটা আত্মহত্যা, তাও গ্রহণযোগ্য মনে করতাম। কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন যে বাথরুম ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে তাঁকে বের করা হয়।'

'আমার মনে আছে।'

'তার পরেও আপনি বলছেন হত্যাকাণ্ড?'

'জ্বি, বলছি।'

হোম মিনিস্টার হাসতে-হাসতে বললেন, 'হত্যাকারী কে তাও কি জেনে গেছেন?'

'অনুমান করছি।'

'অনুমানও করে ফেলেছেন! আপনি দেখছি খুবই ওস্তাদ লোক!'

'স্যার, আপনি শুরুতে বলেছিলেন, আপনি আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। এখন কিন্তু তা করছেন না। আমার মনে হয় আপনার উচিত আমার কথা এককথায় উড়িয়ে না-দেওয়া। আমার অনুমানক্ষমতা ভালো। অতীতে অনেক বার তার প্রমাণ দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেব।'

'আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব আপনি চোখের সামনে দেখতে পান।'

মিসির আলি কিছু না-বলে খাওয়া শেষে করে উঠলেন। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললেন, 'আমি তাহলে যাই?'

'বসুন, খানিকক্ষণ বসুন। পান আছে, পান খান।'

'আমার পান খাওয়ার অভ্যাস নেই।'

'পান এমন কিছু জটিল খাদ্য না যে তা খাবার জন্যে অভ্যাস করতে হয়। মুখে দিয়ে চিবোলেই পান খাওয়া হয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। দীর্ঘ সময় চিবানো হয় বলে প্রচুর জারক রস বের হয়ে হজমে সহায়তা করে। বসুন। নিজের হাতে পান বানিয়ে দেব। খেয়ে দেখুন।'

হোম মিনিস্টারের হাতে-বানানো পান চিবুতে-চিবুতে মিসির আলির মনে হল এখানে আসা ঠিক হয় নি। দিনটাই নষ্ট হয়েছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার অনুমানশক্তি তো প্রবল। এখন বলুন দেখি আমার সম্পর্কে আপনার কী অনুমান? সংক্ষেপে বলুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে উঠতে হবে। নিন, সিগারেট টানতে-টানতে বলুন। আপনার সিগারেটের অভ্যাস আছে তো?'

'আছে।'

মিনিস্টার সাহেব নিজেই লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি ভান করতে পছন্দ করেন। শুধু পছন্দ না, ভান করাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন, আপনি অতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা দুপুরে করেন। এবং একজনকে সঙ্গে নিয়ে খান, যাতে সে প্রচার করতে পারে মিনিস্টার সাহেব কী রকম ভালোমানুষ এবং কত সাধারণ খাবার খায়। অর্থের অভাবে আপনি ভালো খাবার খেতে পারছেন না অথচ বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট ক্রমাগত টানছেন। আপনি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছেন। কিন্তু যে-ঘড়িটি আপনার হাতে আছে তার নাম রোলেক্স। আমি যতদূর জানি, পৃথিবীর দামী ঘড়ির মধ্যে এটি একটি। প্রায় লাখখানেক টাকা দাম। যিনি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরবেন, তিনি হাতে দেবেন দু' শ' তিন শ' টাকা দামের ঘড়ি। এটাই স্বাভাবিক। তবে এই ঘড়ি আপনি নিজের টাকায় কেনেন নি। উপহার হিসেবে পেয়েছেন। এই একটা ব্যাপার অবশ্যি আছে। উপহার হিসেবে পেয়েছেন এটা কী করে অনুমান করেছি, ব্যাখ্যা করব?'

মিনিস্টার সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই। আপনার অনুমানশক্তি ভালো, স্বীকার করছি।'

'তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি আপনি আমাকে ওসমান গনি হত্যারহস্য নিয়ে কাজ করবার অনুমতি দেবেন?'

'আপনার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ কী?'

'আমার আগ্রহের কারণ হচ্ছে—আমি এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। কিংবা বলা যায় আমাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেই অংশ আপনার অজানা নয়। ওসমান গনি সাহেবকে আমি একটি চিরকুট লিখি। তিনি ঐ চিরকুট পাওয়ার পর আপনাকে টেলিফোন করেন।

হোম মিনিস্টার শুকনো গলায় বললেন, 'ঠিক আছে—আপনি রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করুন। কেস সিআইডি-র হাতে দিয়ে দিচ্ছি। ওদের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি কাজ করবেন। পুলিশ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারে, সেই হিসেবেই সাহায্য চাওয়া হবে।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। হোম মিনিস্টার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন বিরক্ত চোখে। মিসির আলি সেই বিরক্তি অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বললেন, 'স্যার, যাই। আপনাকে ধন্যবাদ।'

৭

নাদিয়া অবাক হয়ে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার বাবার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত চালাতে? পুলিশ আপনাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে?' 'জ্বি, হোম ডিপার্টমেন্টের চিঠি আছে। আপনি কি পড়তে চান?'

'না, পড়তে চাই না। চিঠি আপনার কাছে থাকুক। আমি বুঝতে পারছি না, এখানে তদন্তের কী আছে। হার্ট ফেলিওরে যারা মারা যায় তাদের সবার বেলাতেই কি তদন্ত হয়? সাধারণ একটি মৃত্যু. . . . . .'

'মৃত্যু সাধারণ কি না এ-বিষয়ে আপনার নিজেরও কিন্তু সন্দেহ আছে। শুরুতে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার ধারণা এটা আত্মহত্যা।'

'আমি তখন গভীর শোকের মধ্যে ছিলাম। প্রবল শোকে মানুষের চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। সহজ জিনিসকে জটিল মনে হয়। এটাই স্বাভাবিক। আপনার কি তা মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, মনে হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তার চেয়েও বড় কথা, বাবা মারা গেছেন বাথরুমে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙা হয়।'

'তাও জানি।'

'তাহলে ঝামেলা করতে চাইছেন কেন?'

'আমি কোনো ঝামেলা করতে চাইছি না। ঝামেলা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আমি শুধু এ-বাড়ির মানুষদের কিছু প্রশ্ন করে চলে যাব। এক দিন, বড়জোর দু' দিন লাগবে।'

'পুলিশের কী কারণে সন্দেহ হল যে বাবার মৃত্যু তদন্তযোগ্য একটি বিষয়?'

'পুলিশের সন্দেহ হয় নি। তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট মেনে নিয়েছে। সন্দেহটা হয়েছে আমার।'

'সন্দেহ হবার কারণ কী?'

'অনেক কারণ আছে।'

'একটা কারণ বলুন।'

'দরজা ভেঙে আপনার বাবাকে বের করতে হল, এটাই সন্দেহের প্রধান কারণ। আমি আপনাদের বাথরুম দেখেছি—'

'জাস্ট এ মিনিট, বাথরুম কখন দেখলেন?'

'প্রথম যে-বার এ-বাড়িতে এসেছিলাম। আপনার বাবার ডেডবডি বিছানায় শোয়ানো, তখন ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দিকে তাকালাম—'

'মিসির আলি সাহেব, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, ঐ বাথরুমে বাবা মারা যান নি।'

'তাতে অসুবিধা নেই। একটা বাথরুম দেখে অন্য বাথরুমগুলি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আমি বাথরুমের লকিং সিস্টেম আগ্রহ নিয়ে দেখলাম। ভেতর থেকে লক করা যায়। একবার লক করলে বাইরে থেকে খোলা যায় না। তবে বাইরে থেকে চাবি দিয়ে খোলা যায়। যায় না?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'আপনার বাবার বাথরুম ছিল ভেতর থেকে তালাবন্ধ। খুব সহজেই বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দরজাটা খোলা যেত। তা না-করে আপনারা পুলিশ ডেকে আনলেন।'

নাদিয়া হেসে ফেললেন। তাঁর চোখে-মুখে এতক্ষণ যে কঠিন ভাব ছিল তা দূর হয়ে গেল। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নিন মিসির আলি সাহেব, চা নিন। চা খেতে-খেতে কথা বলি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। নাদিয়া হাসিমুখে বললেন, 'আপনার কথা সত্যি। চাবি দিয়ে বাথরুমের দরজা খোলা যায়। এ-বাড়ির প্রতিটি দরজাই এ-রকম। এ-বাড়িতে বাথরুম নিয়ে ঘরের সংখ্যা হচ্ছে তেত্রিশ। তেত্রিশটি চাবির একটা বড় গোছা। কোনো চাবিতে নম্বর দেওয়া নেই। কারণ চাবিগুলি ব্যবহার করা হয় না। তেত্রিশটি চাবি থেকে একটা বাথরুমের চাবি অনুমানের ওপর বের করা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া চাবির গোছা থাকে বাবার কাছে। তিনি তা কোথায় রেখেছেন তা আমাদের জানা নেই। এখন একজন বুদ্ধিমান লোক হিসেবে আপনি আমাকে বলুন, এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত। চাবির গোছা খুঁজে বেড়ানো উচিত, না দরজা ভাঙা উচিত।

'দরজা ভাঙা উচিত।'

'সেই কাজটিই আমরা করেছিলাম। আরেকটি কথা—পুলিশকে ডেকে এনে দরজা ভাঙা হয় নি। দরজা যখন ভাঙা হচ্ছে তখনই পুলিশ চলে আসে। সম্ভবত আপনার জানা নেই, দু' জন পুলিশ সেন্ট্রি আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়। হৈচৈ শুনে তারা নিচে থেকে ওপরে চলে আসে। আমার কথাগুলি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, মনে হচ্ছে।'

'এর পরেও আপনি তদন্ত চালিয়ে যেতে চান?'

'যদি আপনি অনুমতি দেন তবেই তদন্ত চালাব।'

'আমি অনুমতি দিলাম। এ-বাড়িতে যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ঘুরেফিরে দেখুন। সবচেয়ে ভালো হয় কী করলে জানেন? সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি অতিথি হিসেবে এ-বাড়িতে উঠে আসেন। যতদিন আপনার দরকার এ-বাড়িতেই থাকবেন। খাওয়াদাওয়া এখানে করবেন। তদন্তের কাজ শেষ হলে চলে যাবেন। এতে আমার নিজেরও সুবিধা হয়।'

'কি সুবিধা?'

'আপনার পাশাপাশি থেকে তদন্তের ধারাটা দেখতে পারি। বইপত্রে পড়েছি ডিটেকটিভরা কী করে খুনী পাকড়াও করে। বাস্তবে কখনো দেখি নি। আপনার কারণে সেই সুযোগ পাওয়া যাবে।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কী করে ধারণা হল যে আমি খুনী ধরতে এসেছি?'

'সঙ্গত কারণেই এ-ধারণা হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা—এই দু' কারণে তদন্তের জন্যে বিশেষজ্ঞ আনা হয় না। খুনটুন হলে তবেই বিশেষজ্ঞ আসে। আমি কি ভুল বলছি?'

'না, ভুল বলেন নি।'

'আপনি তাহলে আসছেন এ-বাড়িতে?'

'জ্বি, আসছি।'

'তাহলে দেরি করবেন না। আজই চলে আসুন। দি আরলিয়ার দি বেটার।'

এক স্যুটকেস বই এবং এক স্যুটকেস কাপড়চোপড় নিয়ে সন্ধ্যাবেলা মিসির আলি 'রোজ ভিলায়' উঠে এলেন। আব্দুল মজিদ নামের মধ্যবয়স্ক এক লোক তাঁকে থাকার ঘর দেখিয়ে দিল। বিরাট ঘর। অ্যাটাচড বাথরুম। সেই বাথরুমও বিশাল। বাথটাব আছে। ঠাণ্ডা পানি, গরম পানির ব্যবস্থা আছে। বাথরুমে যে-ব্যাপারটা তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল, তা হল বড় একটা ঘড়ি। এখন পর্যন্ত কোনো বাথরুমে তিনি ঘড়ি দেখেন নি।

ঘরের আসবাবপত্রে রুচির ছাপ স্পষ্ট। খাটের পাশে বেড-সাইড কার্পেট। এক কোণায় জানালার পাশে লেখার টেবিল। টেবিলে কাগজ, কলম, খাম, পোস্টেজ স্ট্যাম্প থরেথরে সাজানো। অন্য প্রান্তে বিরাট ওয়ার্ডড্রোব। দেয়ালে রেনোয়ার দু'টি ছবির প্রিন্ট। দু'টিই অপূর্ব। প্রিন্ট মনেই হয় না। ঘরে কোনো আয়না নেই—এই একমাত্র ত্রুটি।

'আব্দুল মজিদ।'

'জ্বি স্যার।'

'ঘর খুব পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর করে সব সাজানো, কিন্তু কোনো আয়না নেই, ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'ড্রেসিং রুম স্যার আলাদা। আয়না ড্রেসিং রুমে।'

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না, যখন দেখলেন এই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দু'টি ঘর আছে। একটি বসার ঘর, অন্যটি ড্রেসিং রুম। বসার ঘরে টেলিফোন এবং

ছোট্ট টিভি সেট আছে।

'স্যার, আপনার খাবার কি এইখানে দিয়ে যাব, না ডাইনিং টেবিলে গিয়ে খাবেন?'

'এখানেই দিয়ে যাবেন।'

'ডিনার কখন দেব স্যার?'

'আমি একটু রাত করে খাই। দশটার দিকে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। এখন কি চা দিয়ে যাব?'

'এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। তার আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'স্যার, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'আচ্ছা, তুমি করেই বলব। প্রশ্নের জবাব দিতে কি কোনো অসুবিধা আছে?'

'জ্বি–না স্যার, অসুবিধা নেই। আপা বলে দিয়েছেন আপনি যা জানতে চান তা যেন বলি।'

'আপা যদি বলত—ওঁর প্রশ্নের জবাব দিও না, তাহলে কি জবাব দিতে না?'

মজিদ চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'বস মজিদ।'

মজিদ বলল, 'আমি বসব না স্যার। যা বলার দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়েই বলব।'

'বেশ, তাহলে প্রশ্ন করি। খুব সহজ প্রশ্ন। তুমি কতদিন এ–বাড়িতে আছ?'

'এগার বছর।'

'কাঁটায়–কাঁটায় এগার বছর, না একটু বেশি বা একটু কম?'

'এগার বছর এক মাস।'

'তোমার কাজ কী?'

'স্যারের একটা লাইব্রেরি আছে। মিউজিক লাইব্রেরি, গানের অ্যালবাম, ক্যাসেট, সিডি ক্যাসেটের লাইব্রেরি। আমি সেই লাইব্রেরি দেখাশোনা করি।'

'তোমার চাকরিজীবন কি এখানেই শুরু, না এর আগে কোথাও কাজ করেছ?'

'বিভিন্ন জায়গায় নানান ধরনের কাজ করেছি। রানা কনস্ট্রাকশান কোম্পানিতে ছিলাম প্লামিং মেকানিক। সেখানে তিন বছর কাজ করি। তারপর স্যারের লাইব্রেরির দায়িত্ব নিই।'

'মিউজিক লাইব্রেরির জন্যে যখন আলাদা একজন লোক আছে, তখন নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় যে লাইব্রেরিটা ওসমান গনি সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়।'

'জ্বি স্যার, খুবই প্রিয়।'

'তুমি যখন লাইব্রেরিতে থাক না, তখন কি এটা তালাবন্ধ থাকে?'

'জ্বি স্যার, তালাবন্ধ থাকে।'

'এই বাড়ির সব ঘরের জন্যে চাবি আছে—সেই চাবির গোছা কার কাছে থাকে?'

'স্যারের কাছে। তবে এই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে।'

'এখন ঐ চাবিগুলি কোথায়?'

'লাইব্রেরি ঘরের ড্রয়ারে। এনে দেব স্যার?'

'না, আনতে হবে না। ওসমান গনি সাহেব যখন বাথরুমে আটকা পড়লেন, হৈচৈ

হতে থাকে, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'লাইব্রেরি ঘরে।'

'হৈচৈ শুনে ছুটে গেলে?'

'জ্বি না স্যার, আমি যাই নি। আমি কিছু বুঝতে পারি নি। লাইব্রেরি ঘরে আছে এয়ার কুলার। এই জন্যে দরজা–জানালা বন্ধ থাকে। ঐ রাতে এয়ার কুলার চালু ছিল। দরজা–জানালা ছিল বন্ধ। বাইরের কোনো শব্দ কানে আসে নি।'

'তুমি কখন জানতে পারলে?'

'ঘটনার দু' ঘন্টা পর।'

'গভীর রাতে এতক্ষণ লাইব্রেরি ঘরে তুমি কী করছিলে?'

'গান শুনছিলাম স্যার।'

'তোমার পড়াশোনা কতদূর?'

'দু' বছর আগে প্রাইভেটে বি· এ· পাস করেছি।'

মিসির আলি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। বি· এ· পাস একজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে তুমি–তুমি করে বলা যায় না। বলা উচিত নয়। সবাইকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়। মিসির আলি আব্দুল মজিদের দিকে ভালো করে তাকালেন। বিশেষত্বহীন চেহারা। দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়ে। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। চোয়াল নড়ছে। পান চিবুচ্ছে বোধহয়। জর্দার গন্ধ আসছে। মিসির আলি বললেন, 'ওসমান গনি সাহেবের স্ত্রীও তো বাথরুমে মারা যান, তাই না।'

'জ্বি।'

'একই বাথরুম?'

'জ্বি, একই বাথরুম।'

'তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'মিউজিক লাইব্রেরিতে ছিলাম।'

'জেগে ছিলে?'

'জ্বি, জেগে ছিলাম।'

আব্দুল মজিদ কী–একটা বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কী বলতে চাচ্ছ বল।'

'কিছু বলতে চাচ্ছি না স্যার।'

'আচ্ছা, যাও।'

'যদি কিছু লাগে, কলিং বেল টিপবেন। আমি চলে আসব।'

'আমার কিছু লাগবে না।'

'চা কি স্যার দিয়ে যাব?'

'দিয়ে যাও।'

আব্দুল মজিদ ঘর থেকে বের হয়েই চা নিয়ে এল। মনে হচ্ছে চা তৈরিই ছিল। মজিদ বলল, 'যদি কফি খেতে চান, কফিও দেওয়া যাবে। খুব ভালো ব্রেজিলিয়ান কফি আছে। পারকুলেটরে কফি তৈরি করা হয়। স্যার খুব পছন্দ করতেন।'

'আমি কফি পছন্দ করি না।'

আব্দুল মজিদ আবারো কী যেন বলতে গেল। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল।

মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'বলতে ইচ্ছা করলে বলতে পার।'

'কিছু বলতে চাই না স্যার।'

রাতে মিসির আলি একা–একা ডিনার শেষ করলেন। খাবার নিয়ে এল আব্দুল মজিদ। মিসির আলির মনে হল, সে তাঁকে দেখছে ভীত চোখে। আড়– চোখে তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ সরিয়ে নিচ্ছে।

'আব্দুল মজিদ।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছ, বলে ফেল।'

আব্দুল মজিদ মাথা নিচু করে নিচু গলায় বলল, 'রাত বারটার পর যদি বাথরুমে যান তাহলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করবেন না।'

'কেন?'

'একটু অসুবিধা আছে স্যার।'

'কী অসুবিধা?'

'দরজা খোলা যায় না।'

'দরজা খোলা যায় না মানে?'

'ভৌতিক কিছু ব্যাপার আছে স্যার। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। দরজা আপনা–আপনি বন্ধ হয়ে যায়। আর খোলে না।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'রাত বারটার পর বাথরুমে গেলে এবং দরজা বন্ধ করলে আপনা–আপনি দরজা বন্ধ হয়ে যায়?'

'সব সময় হয় না স্যার, মাঝে–মাঝে হয়।'

'তোমার ধারণা, ব্যাপারটা ভৌতিক?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা, আমি মনে রাখব। সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

আব্দুল মজিদ মাথা চুলকাতে–চুলকাতে বলল, 'আপাকে এটা না বললে খুব ভালো হয় স্যার। আপা শুনলে খুব রাগ করবেন।'

'আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'আপনার কি পান খাওয়ার অভ্যাস আছে স্যার? পান নিয়ে আসব?'

'আন, পান আন। তবে জর্দা দিও না। আমি জর্দা খাই না।'

রাত এগারটায় মিসির আলির ঘুমুতে যাবার কথা। তিনি বারটা পর্যন্ত জেগে রইলেন। বাথরুমের দরজার ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে। বারটা দশ মিনিটে বাথরুমে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করলেন। যথা সময়ে বের হয়ে এলেন। দরজা খুলতে কোনো সমস্যা হল না। তবে রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বারবার ঘুম ভেঙে গেল। দুঃস্বপ্নও দেখলেন। সেই দুঃস্বপ্নে লম্বা একটা মানুষ এসে বলল, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি সোনার দাঁত কিনবেন? আমার কাছে সোনার দাঁত আছে। খাঁটি সোনা।' মিসির আলি বললেন, 'না, আমি সোনার দাঁত কিনব না।'

'আপনাকে স্যার কিনতেই হবে। এই কে আছিস, স্যারের কয়েকটা দাঁত টেনে

তুলে ফেল। দেখি দাঁত না কিনে স্যার যায় কোথায়।'

লোকটির কথা শেষ হতেই বাথরুমের দরজা খুলে সাঁড়াশি হাতে একটা ভয়ংকর-দর্শন মানুষ বের হল। মিসির আলি ছুটছেন। লোকটাও সাঁড়াশি হাতে পিছনে পিছনে ছুটছে।

রাত তিনটার দিকে ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলেন। তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে একতলায়। দোতলায় পায়ের শব্দ হচ্ছে। চটির ফটফট শব্দ আসছে। কেউ একজন বারান্দায় এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছে এবং আসছে। নিশ্চয়ই নাদিয়া।

৮

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল।

অতসী মুখ বের করল। মিসির আলি বললেন, 'ভালো আছ অতসী?' অতসী স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

'তোমার বাবা বাসায় আছেন তো?'

অতসী জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা আসবে আমার কাছে। তোমরা এলে না। শেষে নিজেই এলাম। ঠিকানা বদলেছ, খুঁজে বের করতে কিছু সময় লেগেছে। আজ কি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করা যাবে? না আজও যাবে না?'

'যাবে।'

'তাহলে দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। ঘরে ঢুকি।'

অতসী দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?' অতসী নিচু গলায় বলল, 'না, অবাক হই নি। আপনি আসবেন আমি জানতাম। বসুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

অতসী ভেতরে চলে গেল। অম্বিকাবাবু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকলেন। লুঙ্গি পরা, খালি গা। কাঁধের ওপর ভেজা গামছা। তিনি অবাক হয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মেয়ের মতো তিনিও পলক না-ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।'

অম্বিকাবাবু বললেন, 'স্যার বসুন। আপনি মিসির আলি। আগেও একবার এসেছিলেন। আমার মেয়ে আমাকে বলেছে। কি ব্যাপার স্যার?'

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি বসুন। আমি বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।'

অম্বিকাবাবু বসলেন। মনে হচ্ছে একটু ভয় পাচ্ছেন। বারবার ভেতরের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। মনে হচ্ছে তিনি চাচ্ছেন তাঁর মেয়ে এসে বসুক তাঁর কাছে।

'অম্বিকাবাবু।'

'বলুন।'

'আপনি ওসমান গনিকে চেনেন, তাই না?'
'জ্বি, চিনি।'
'তিনি হাত দেখাবার জন্যে আপনার কাছে আসতেন?'
'জ্বি।'
'তাঁর স্ত্রীও কি এসেছিলেন?'
'এক দিন এসেছিলেন।'
'ওসমান গনি প্রায়ই আসতেন?'
'মাঝে-মাঝে আসতেন। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন।'
'উনি কি পামিস্ট্রি বিশ্বাস করতেন?'
'না। উনি নাস্তিক ধরনের মানুষ। কোনো কিছুই বিশ্বাস করতেন না।'
'আপনি তাঁর মেয়েটিকে চেনেন?'
'না।'
'কখনো দেখেন নি?'
'না।'
'অতসী বলছিল আপনার শরীর খারাপ। কী রকম খারাপ?'
'আমার মানসিক কিছু সমস্যা আছে। মাঝে-মাঝে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। তখন কি করি বা কি না করি কিছুই বলতে পারি না। কিছু মনেও থাকে না।'
'আপনি যে আমার কাছে গিয়েছিলেন তা মনে আছে?'
'জ্বি-না, মনে নেই।'
'আমাকে কী বলেছিলেন—কিছুই মনে নেই?'
'না। স্যার, ঐ সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না।'
অতসী চা নিয়ে ঢুকল। আগের মতো দুধ-চিনি ছাড়া চা নয়। দুধ-চা। চায়ের সঙ্গে বিসকিট আছে। চানাচুর আছে। মনে হচ্ছে আগের হতদরিদ্র অবস্থা এরা কাটিয়ে উঠেছে।
'অম্বিকাবাবু।'
'বলুন।'
'আপনি কি কখনো ওসমান গনি সাহেবের বাড়িতে গিয়েছেন?'
'না।'
'কখনো যান নি?'
'না।'
'উনি কখনো আপনাকে যেতে বলেন নি?'
'না।'
অতসী দু' কাপ চা এনেছিল। মিসির আলি তাঁর কাপ শেষ করলেন। কিন্তু অম্বিকাবাবু নিজের কাপ ছুঁয়েও দেখলেন না। তিনি সারাক্ষণ বসে রইলেন মাথা নিচু করে। তাঁর দৃষ্টি চায়ের কাপের দিকে।
'ওসমান গনি যে মারা গেছেন তা কি আপনি জানেন?'
'জানি।'
'কীভাবে জানলেন? পত্রিকায় পড়েছেন?'

অম্বিকাবাবু জবাব দিলেন না। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন।

'উঠি অম্বিকাবাবু।'

'আচ্ছা।'

'আরেকদিন এসে আপনাকে হাত দেখিয়ে যাব।'

অম্বিকাবাবু মৃদু গলায় বললেন, 'এখন আর হাত দেখতে পারি না। অসুখের পর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাহলে গল্প করার জন্যেই না-হয় আসব। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

অম্বিকাবাবু কিছু বললেন না। মিসির আলি রোজ ভিলায় ফিরে এলেন। রোজ ভিলা তাঁর কাছে এখন নিজের বাড়িঘরের মতোই লাগছে। অন্যের বাড়িতে থাকছেন, খাওয়াদাওয়া করছেন—এ নিয়ে কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করছেন না। রোজ ভিলায় আজ নিয়ে পঞ্চম দিন। এখন পর্যন্ত আব্দুল মজিদ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নি। যদিও এ-বাড়িতে বেশ কিছু মানুষ বাস করে। দু' জন বাবুর্চি আছে। এক জন একতলায় থাকে। সে পুরুষ। নাম মকিম মিয়া। অন্যজন মহিলা—জাহানারা। সে থাকে দোতলায়। দোতলায় ওসমান গনি সাহেবের দূর সম্পর্কের এক ফুপুও থাকেন। আশির কাছাকাছি বয়স। হুইল চেয়ারে করে মাঝেমধ্যে বারান্দায় আসেন। এই বৃদ্ধা মহিলার দেখাশোনা করার জন্যে অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে আছে। সালেহা নাম।

নাদিয়ার কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্যেই একজন কাজের লোক আছে। অ্যাংলো মেয়ে। নাম এলিজাবেথ। ডাকা হয় এলি করে।

দোতলার পুরোটাই নারীমহল। পুরুষদের সন্ধ্যার পর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। একতলায় পুরুষ রাজত্ব। এখানে সবাই পুরুষ। দু' জন ড্রাইভার। তিন জন দারোয়ান। দু' জন মালী। এরাও একতলার বাসিন্দা। তবে এরা মূল বাড়িতে থাকে না। বাড়ির পিছনে ব্যারাকের মতো একসারিতে কয়েকটা ঘর আছে, এরা থাকে সেখানে। মূল বাড়িতে সাফাকাত নামের এক ভদ্রলোক থাকেন। সবাই তাঁকে ম্যানেজার সাহেব ডাকেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিসির আলির কয়েকবারই দেখা হয়েছে। কখনো কথা হয় নি। সাফাকাত সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি হলেই তিনি দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যান। মিসির আলির কয়েকবারই ইচ্ছা করেছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—'আপনি আমাকে দেখলে এমন করেন কেন?'

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয় নি। মিসির আলি নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে চাচ্ছেন, কিন্তু গোছাতে পারছেন না। সব এলোমেলো হয়ে আছে। অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত ন'টার মতো বাজে। মিসির আলি তাঁর শোবার ঘরে খাতা খুলে বসেছেন। পেনসিলে নোট করছেন। এখন লিখছেন সেইসব প্রশ্ন, যার উত্তর তিনি বের করতে পারছেন না :

(১) ওসমান গনির মতো ধনবান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি প্রায়ই আসতেন অম্বিকাবাবুর কাছে। কিন্তু অম্বিকাবাবু কখনো এ-বাড়িতে আসেন নি। যদিও উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। ওসমান গনি অনায়াসে ডেকে পাঠাতে পারতেন অম্বিকাবাবুকে। কেন তা করেন নি?

(২) ওসমান গনি পামিস্ট্রি বিশ্বাস করতেন না। তাহলে ঠিক কোন প্রয়োজনে

অম্বিকাবাবুর কাছে তিনি যেতেন? অম্বিকাবাবুর কথা অনুযায়ী ওসমান গনি তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। কেন পছন্দ করতেন? অম্বিকাবাবুর চরিত্রের কোন দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল?

(৩) অম্বিকাবাবু এবং তাঁর কন্যা আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। এরা দু' জনই আমাকে ভয় পাচ্ছে। কেন? আমার সঙ্গে যাতে দেখা না-হয় সে-কারণে এরা বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। কেন?

দরজায় টোকা পড়ছে। মিসির আলি বললেন, 'কে?'

'স্যার, আমি মজিদ। রাতের খাবার নিয়ে এসেছি স্যার।'

মিসির আলি উঠে দরজা খুলে দিলেন। মজিদ বলল, 'খাওয়া শেষ হবার পর আপা তাঁর সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'আমি দোতলায় যাব, না তিনি নিচে নেমে আসবেন?'

'স্যার, আমি আপনাকে দোতলায় নিয়ে যাব।'

নাদিয়া দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। মিসির আলি ঢুকতেই হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'ভালো।'

'আপনার তদন্ত কেমন এগুচ্ছে?'

'এগুচ্ছে।'

'বসুন। বলুন তো কি জন্যে ডেকেছি?

'বুঝতে পারছি না।'

'জোছনা দেখার জন্যে ডেকেছি। বারান্দা থেকে সুন্দর জোছনা দেখা যায়। ঘরে এবং বাগানের সব বাতি নিভিয়ে দিতে বলব, তখন দেখবেন, কী সুন্দর জোছনা। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলি সব সময় ডিসটার্ব করে। তবে সৌভাগ্যক্রমে আজ স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলছে না।'

অ্যাংলো মেয়েটি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। মেয়েটির মুখ ভাবলেশহীন। কেমন পুরুষালি চেহারা। সে রোবটের মতো কাপে চা ঢালছে। নাদিয়া বললেন, 'এলি, তুমি বাতি নিভিয়ে দিতে বল। আমরা জোছনা দেখব।'

এলি মাথা নাড়ল। মোটেই বিস্মিত হল না। তার অর্থ হচ্ছে বাতি নিভিয়ে জোছনা দেখার এই পর্বটি নতুন নয়। আগেও করা হয়েছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'বলুন।'

'আপনি মজিদ ছাড়া আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'এখনো করি নি, তবে করব।'

'সময় নিচ্ছেন কেন?'

'গুছিয়ে আনতে চেষ্ট করছি। গুছিয়ে আনলেই জিজ্ঞেস করব।'

'ওরা নিজ থেকে কিছু বলছে না?'

'না।'

নাদিয়া হাসতে-হাসতে বললেন, 'এরা কি আপনাকে গোপনে বলে নি এ-বাড়িতে ভূত আছে? গভীর রাতে বাথরুমে গেলে আপনা-আপনি বাথরুমের দরজা বন্ধ

হয়ে যায়? মজিদ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে আপনাকে এই কথা বলেছে এবং অনুরোধ করেছে যেন আমি না-জানি। কি, করে নি?

'করেছে।'

'আপনার বাথরুমের দরজা কি কখনো বন্ধ হয়েছে?'

'এখনো হয় নি।'

নাদিয়া সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'আমার বাথরুমের দরজাও বন্ধ হয় নি। ওদের প্রত্যেকের বেলাতেই নাকি হয়েছে। আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন মিসির আলি সাহেব?'

'না, করি না।'

'আমিও করি না।'

'আপনার বাবা—তিনি কি করতেন?'

নাদিয়া কিছু না-বলে সিগারেটে টান দিতে শুরু করলেন। হাতের ইশারায় এলিজাবেথকে চলে যেতে বললেন। এলিজাবেথ চলে গেল, এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের সব বাতি নিভে গেল। নাদিয়া বললেন, 'খুব সুন্দর জোছনা, তাই না মিসির আলি সাহেব?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনার বাবা কি ভূত বিশ্বাস করতেন?'

'তিনি নাস্তিক ধরনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা শুরু করলেন।'

'কেন?'

'ঠিক বলতে পারব না কেন। তাঁকে কখনো জিজ্ঞেস করি নি।'

মিসির আলি বললেন, 'বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়া-সংক্রান্ত 'ভয়' পাওয়া শুরু হল কখন? আপনার মা'র মৃত্যুর পর, না তারো আগে?'

'তারো আগে। এর একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটা আপনাকে বলি। আপনার তদন্তে সাহায্য হতে পারে। আপনি পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন। টী-পট ভর্তি চা। চা খেতে-খেতে গল্প শুনুন। তার আগে বলুন, জোছনা কেমন লাগছে।'

'ভালো লাগছে।'

'জোছনা দেখার এই কায়দা কার কাছ থেকে শিখেছি জানেন? বাবার কাছ থেকে। তিনি এইভাবে জোছনা দেখতেন। যে-রাতে খুব পরিষ্কার জোছনা হত, তিনি টেলিফোন করে দিতেন মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র সাহেবকে। তারা বাসার সামনের স্ট্রীট লাইটের বাতি নিভিয়ে দিত। ক্ষমতাবান মানুষ হবার অনেক সুবিধা।'

মিসির আলি পা উঠিয়ে বসলেন। নাদিয়া গল্প শুরু করল—

'আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন খুব অল্প বয়সে। একুশ বছর বয়সে। আমার মা'র বয়স তখন পনের। ভালবাসার বিয়ে। বাবার তখন খুব দুর্দিন যাচ্ছে। টাকাপয়সা নেই। পরের বাড়িতে থাকেন। এর মধ্যে নতুন বৌ, যাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নানান দুঃখ-কষ্টে তাঁদের জীবন কাটছে। শুরুটা সুখের নয়, বলাই বাহুল্য। এর মধ্যে মা কনসিভ করে ফেললেন। এই অবস্থায় নতুন একটি শিশু পৃথিবীতে আনা চরম বোকামি। কাজেই বাবা-মা দু' জন মিলেই ঠিক করলেন, শিশুটি নষ্ট করে

দেওয়া হবে। হলও তাই। আনাড়ি ডাক্তার। অ্যাবোরশান খব ভালোভাবে করতে পারল না, যে-কারণে মা'র সন্তানধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। বিয়ের দশ বছর পরেও তাঁর আর কোনো ছেলেমেয়ে হল না। ততদিনে বাবা দু' হাতে টাকা রোজগার করতে শুরু করেছেন। অর্থের সুখ বলতে যা, তা তাঁরা পেতে শুরু করেছেন। বড় সুখের পাশাপাশি বড় দুঃখ থাকে। তাঁদের বড় দুঃখ হল-সন্তানহীন জীবন কাটাতে হবে এই ধারণায় অভ্যস্ত হওয়া।....

মা'র জন্যে এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাবা সেই কঠিন ব্যাপারটা একটু সহজ করবার জন্যে একটা ছ' মাস বয়সী ছেলে দত্তক নিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ছেলেটি দত্তক নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই মা কনসিভ করলেন। আমার জন্ম হল। ছেলেটির সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ন' মাসের মতো।....

আমরা দু' জন একসঙ্গে বড় হচ্ছি। সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই মা'র সমস্ত স্নেহ তখন আমার দিকে। ছেলেটিকে তিনি সহ্যও করতে পারেন না। আবার কিছু বলতেও পারেন না—কারণ ছেলেটিকে বাবা খুব পছন্দ করতেন।...

মা একেবারেই করতেন না। ছেলেটা ছিল লাজুক ধরনের। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাটথা বলত না। মা অতি তুচ্ছ অপরাধে তাকে শাস্তি দিতেন। শাস্তিটা হল আর কিছুই না, বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। বাথরুম ছিল মার জেলখানা। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে বাথরুমে থাকার মেয়াদ ঠিক হত।'

মিসির আলি কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বললেন, 'আপনাকে কি এই জাতীয় শাস্তি পেতে হয়েছে?

'না, আমাকে এ-ধরনের শাস্তি কখনো দেওয়া হয় নি। যাই হোক, যা বলছিলাম—এক রাতের কথা। মা ছেলেটিকে শাস্তি দিয়েছেন। বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ছেলেটিকে বাথরুমে ঢোকানোর পর খুব ঝড় শুরু হল। ঘরের জানালার বেশ কয়েকটা কাঁচ ভেঙে গেল। আমাদের বাসার পিছনে বড়ো একটা ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল। ঐ গাছ ভেঙে বাড়ির ওপর পড়ল। মনে হল পুরো বাড়ি বুঝি ভেঙে পড়ে গেল। আমি চিৎকার করে কাঁদছি। কারেন্ট চলে গেছে। সারা বাড়ি অন্ধকার। বিরাট বিশৃঙ্খলার মধ্যে সবাই ভুলে গেল ছেলেটির কথা। তার কথা মনে হল পরদিন ভোরে। বাথরুমের দরজা খুলে দেখা গেল সে বাথটাবে চুপচাপ বসে আছে। তাকিয়ে আছে বড়-বড় চোখে। তার দেহে যে প্রাণ নেই, তা তাকে দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছিল না। ছেলেটি মারা গিয়েছিল ভয়ে হার্টফেল করে। বাথরুম-সংক্রান্ত ভয়ের শুরু সেখান থেকে। গল্পটা কেমন লাগল মিসির আলি সাহেব?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না।

নাদিয়া হাই তুলতে-তুলতে বলল, 'রাত অনেক হয়েছে। যান, ঘুমিয়ে পড়ুন। আজ সারা রাত যদি বাতি না জ্বালানো হয় আপনার কি অসুবিধা হবে?'

'জ্বি-না, অসুবিধা হবে না।'

'মজিদ আপনার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। অসম্ভব সুন্দর একটা জোছনা রাত। ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে এ-রাত নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

রাত বেশি হয় নি। বারটা দশ। ঘর অন্ধকার করে মোমবাতি জ্বালানোর কারণেই বোধহয়—নিশুতি রাত বলে মনে হচ্ছে। মিসির আলি খানিকক্ষণ লেখালেখি করার চেষ্টা করলেন। লেখার বিষয়—'অনিদ্রা'। অনিদ্রা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধটি তিনি গত দু' বছর ধরে লেখার চেষ্টা করছেন। যখনই কিছু মনে হয় তিনি লিখে ফেলেন। আজ কিছুই মনে আসছে না। তবু লিখছেন।

'স্যার।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। আব্দুল মজিদ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?'

'একটা চার্জ লাইট নিয়ে এসেছি স্যার। আপা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'দরকার ছিল না।'

'আপা বললেন, আপনি রাত জেগে পড়াশোনা করেন। মোমবাতির আলোয় পড়তে অসুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে, রেখে যাও।'

ফ্যান চলছে না। গরম লাগছে। মিসির আলি বারান্দায় এসে বসলেন। বারান্দার এক কোণার মেঝেতে আরো একজন বসে আছে। মিসির আলিকে দেখে সে পিলারের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিল। মিসির আলি বললেন, 'কে ওখানে? সাফকাত সাহেব না?'

'জ্বি স্যার।'

'লুকিয়ে আছেন কেন? এখানে আসুন, গল্প করি।'

সাফকাত পিলারের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে এল। মিসির আলি পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, চেয়ারে বসুন।'

'জ্বি–না স্যার।'

'না কেন? চেয়ারে বসতে অসুবিধা আছে?'

সাফকাত বসে পড়ল। মিসির আলি বললেন, 'আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন? দেখা হলেই পালিয়ে যান কিংবা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। রহস্যটা কী?'

সাফকাত জবাব দিল না। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল।

'সাফকাত সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি বাথরুমে গিয়েছেন আর আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এ–রকম কি কখনো হয়েছে?'

'দু' বার হয়েছে স্যার।'

'শেষ কবে হল? ওসমান গনি সাহেবের মৃত্যুর আগে, না পরে?'

'উনার মৃত্যুর আগে।'

'কত দিন আগে?'

'আট দিন আগে।'

'খুব ভয় পেয়েছিলেন?'

'জ্বি।'

'দরজা কতক্ষণ বন্ধ ছিল?'

'বলতে পারি না। ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। দরজা খুলে এরা আমাকে বের করে। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যায়। দু' দিন ছিলাম হাসপাতালে।'

'এত ভয় পেলেন কেন?'

'হঠাৎ করে বাথরুম অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ঘন্টার শব্দ শুরু হল।'

'ও আচ্ছা—ঘন্টার শব্দ হচ্ছিল।'

'জ্বি—গির্জায় ঘন্টার যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম শব্দ।'

'গির্জার ঘন্টার শব্দের কথা আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আমার বাড়ি স্যার বরিশালের মূলাদি। ঐখানে ক্যাথলিকদের একটা গির্জা আছে।'

'বাতি নিভে গেল, গির্জার ঘন্টার শব্দ হতে লাগল, আর কী হল?'

'ফুলের গন্ধ পেলাম স্যার।'

'কি ফুল?'

'কাঁঠালিচাঁপা ফুল।'

'এই বাড়িতে আপনি তাহলে খুব ভয়ে-ভয়ে থাকেন?'

'জ্বি স্যার। কোনো সময়েই বাথরুমের দরজা বন্ধ করি না। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথাও স্যার ভাবছি। চাকরি কোথাও পাচ্ছি না। চাকরির বাজার খুব খারাপ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আপা আমাকে খুব পছন্দ করেন। উনাকে একা ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করে না।'

'আপনার আপা প্রসঙ্গে বলুন, উনি কেমন মেয়ে?'

'খুব তেজী মেয়ে স্যার। খুব সাহসী। সন্ধ্যার পর থেকে এ-বাড়ির লোকজন ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। কিন্তু আপার মনে কোনো ভয়ডর নেই। রাতে-বিরাতে একা-একা ঘুরে বেড়ান। তা ছাড়া স্যার দেখুন, বাবার এত বড় বিজনেস, সব তিনি নিজে দেখছেন। ভালোভাবে দেখছেন।'

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়বে। সাধের জোছনা বেশিক্ষণ দেখা যাবে না। মিসির আলি উঠে পড়লেন। ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঢোকামাত্র আব্দুল মজিদ এল পানির গ্লাস ও বোতল নিয়ে।

'এখনো জেগে আছ মজিদ?'

'জ্বি স্যার। ঘর অন্ধকার—ঘুমাতে ভয়ভয় লাগে। আপনার কি আর কিছু লাগবে?'

'না। কাল সকালে বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার?'

'উনি ঘুম থেকে ওঠেন কখন?'

'বুড়ো মানুষ তো স্যার, রাতে ঘুম হয় না। ফজর ওয়াক্তে ঘুম ভাঙে।'

'আমি খুব ভোরেই ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তুমি চলে যাও। আমার আর কিছু লাগবে না।'

মজিদ তবু দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

মজিদ নিচু গলায় বলল, 'বাড়িঘর অন্ধকার। বাথরুমে যদি যান দরজাটা খোলা রাখবেন স্যার।'

'আমার ভূতের ভয় নেই মজিদ।'

'স্যার, ভূতের ভয় আমারো ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়ায় অনেক কিছু আছে। আমরা আর কতটা জানি! একটু সাবধান থাকলে ক্ষতি তো স্যার কিছু না।'

'আচ্ছা, দেখা যাক।'

রাতে মিসির আলি কয়েকবারই বাথরুমে গেলেন। প্রতি বারই দরজা বন্ধ রাখলেন এবং আশা করতে লাগলেন দরজা আটকে যাবে—কিছুতেই ভেতর থেকে খোলা যাবে না। কিন্তু তেমন কিছু হল না।

মিসির আলি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আকাশ মেঘে ঢাকা। বিজলি চমকাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। দোতলার বারান্দায় চটি ফটফটিয়ে হাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাদিয়া হাঁটছে নিশ্চয়ই। মেয়েটা তাহলে সত্যি-সত্যি ঘুমায় না?

৯

হুইল চেয়ারে যে-বৃদ্ধা বসে আছেন তাঁর চেহারা এই বয়সেও অত্যন্ত সুন্দর। গায়ের রঙ দুধে-আলতায় বলে যে-কথাটি প্রচলিত আছে ভদ্রমহিলাকে দেখে তা সত্যি মনে হয়। মাথার চুল লম্বা এবং সাদা। ধবধব করছে। ধবধবে সাদা চুলেরও যে আলাদা সৌন্দর্য আছে, তা এই বৃদ্ধাকে দেখে বোঝা যায়। বৃদ্ধার হুইল চেয়ার ধরে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও সুশ্রী। এই মেয়েটির নামই সালেহা। কাজের মেয়ে বলে তাকে মনে হয় না। মাথায় ঘোমটা দেওয়া বলে সালেহাকে কেমন বৌ-বৌ মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বৃদ্ধার সামনে বসতে-বসতে বললেন, 'আপনি কেমন আছেন?'

বৃদ্ধা নরম গলায় বললেন, 'বাবা, আমি ভালো আছি। এই বয়সে বেঁচে থাকাই ভালো থাকা।

'আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিই, আমার নাম মিসির আলি . . . . .'

'আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না বাবা। আপনি কে আমি জানি। এখানে কি জন্যে আছেন তাও নাদিয়া বলেছে।'

'দু'-একটা প্রশ্ন করব, যদি কিছু মনে না করেন।'

'কিচ্ছু মনে করব না। আপনি যত ইচ্ছা প্রশ্ন করেন। সব প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো দিতে পারব কি না তাও তো জানি না—বয়স হয়ে গেছে, ঠিকমতো গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না।'

'এই বাড়িতে আপনি কত দিন ধরে আছেন?'

'অনেক দিন। তা ধর কুড়ি বছর। তুমি করে বলে ফেলেছি বাবা। ভুল হয়ে গেছে

'কোনো ভুল হয় নি। আপনি আমাকে তুমি করে বলুন। কিচ্ছু অসুবিধা নেই।

আপনি তাহলে কুড়ি বছর ধরে এদের সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এরা মানুষ কেমন?'

বৃদ্ধা হাত ইশারা করে সালেহা মেয়েটাকে চলে যেতে বললেন। সালেহা চলে গেল। যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। বৃদ্ধা গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'নাদিয়া মেয়েটা খুব ভালো। একটু পাগল ধরনের। রাতে ঘুমায় না, সিগারেট খায়। কিন্তু বড় ভালো, মেয়ে। অন্তরটা বিরাট বড়।'

'মেয়ের বাবা-মা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'ওরা মন্দও না আবার ভালোও না। ভালো-মন্দে মেশানো। কিন্তু নাদিয়া মেয়েটার মধ্যে মন্দের ভাগ খুব সামান্য। এই রকম সচরাচর দেখা যায় না। নিজের ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে না, কিন্তু পরের মেয়ে নাদিয়া আমাকে দেখে। একবার জ্বর হল—এক শ' চার। জ্বরে অচেতন হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি এই মেয়ে আমার মাথায় পানি ঢালছে। চিন্তা কর বাবা—কোটিপতি বাবার মেয়ে! তার মুখের হুকুমে দশজন লোক ছুটে আসবে। সে কিনা মাথায় পানি ঢালে!'

'আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?'

'তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটা বাহরাইনে ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসে নাই। তার কোনো খোঁজখবরও জানি না। ছোটটা থাকে তার বোনের কাছে চিটাগাং। গুণ্ডামি বদমায়েশি এইসব করে। মেজো ছেলেটাকে তো বাবা তুমি দেখেছ। আব্দুল মজিদ।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আব্দুল মজিদ আপনার ছেলে?'

'হ্যাঁ বাবা। আমি জানি সে তোমাকে বলে নাই যে আমি তার মা। কাউকেই বলে না। বাপ-মা'র পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। আমার ছেলেটা ভালো, তবে বোকা ধরনের। বোকা বলেই ভালো। বয়স তো আমার কম হয় নাই। আমি দেখেছি এই জগতে বোকারাই ভালো।'

'বোকা বলছেন কেন? আমার কাছে তো বোকা মনে হয় না।'

'তুমি দূর থেকে দেখেছ, এই জন্যে তোমার কাছে বোকা মনে হয় না। আসলে বোকা।'

'এই বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলে মারা গিয়েছিল, আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কি ব্যাপার বলুন তো।'

'ঐ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না বাবা। ঐটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। এই দুনিয়ায় অ্যাকসিডেন্ট তো হয়। ছেলের নিয়তি ছিল ভয় পেয়ে মৃত্যু—তাই হয়েছে। নিয়তিকে গালাগাল দিয়ে তো লাভ নাই। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন—নিয়তিকে গালি দিও না, কারণ আমিই নিয়তি।'

'পরবর্তী সময়ে যে দেখা গেল বাথরুম আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়, এই সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'মনের ভুল। দরজা হয়তো একটু শক্ত হয়ে লাগে। এম্নি ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। কথায় আছে না—বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়? মনের বাঘটাই বড়।

'আপনার বেলায় কখনো এই জাতীয় কিছু ঘটে নি?'

'না।'

'সালেহা, ঐ মেয়েটির কি এ–রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'একবার নাকি হয়েছে। চিৎকার, হৈচৈ। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে খুলতে পারে না। আমি হুইল চেয়ারে করে গেলাম। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলল। দরজা খুলে দেখি অচেতন হয়ে পড়ে আছে। দাঁতে–দাঁতে লেগে জিহ্বা কেটে বিশ্রী অবস্থা। ঐ যে বললাম মনের বাঘ। তাকেও ধরেছে মনের বাঘে। তুমি কি নিজে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'না, চাই না।'

'না–চাওয়াই ভালো। জিজ্ঞেস করার আসলে কিছু নাই। ভয় পাওয়া এই বাড়ির মানুষের একটা রোগ হয়ে গেছে।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখা হল নাদিয়ার সঙ্গে। তিনি আজও টিয়াপাখি রঙের একটা শাড়ি পরেছেন। সবুজ রঙের প্রতি এই মেয়েটির খুব দুর্বলতা। নাদিয়া থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তদন্ত এগুচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এগুচ্ছে।'

'আমার ফুপুর সঙ্গে কথা বলে এলেন?'

'হ্যাঁ। উনি আপনার কেমন ফুপু?'

'সম্পর্ক বেশ দূরের, তবে দূরের হলেও নিকট আত্মীয় বলতে উনিই আছেন।'

'আপনাকে খুব স্নেহ করেন বলে মনে হল।'

'তা করেন। বেশ স্নেহ করেন। উনি আবার খুব চমৎকার গল্প বলতে পারেন। আমি এত সুন্দর করে গল্প বলতে কাউকে শুনি নি। আপনার তদন্তের ঝামেলা শেষ হলে একবার ওঁর গল্প শুনে যাবেন।'

'তাঁর ছেলেটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'আব্দুল মজিদের কথা বলছেন? বিরাট বোকা। সে বয়সে আমার বড়, কিন্তু প্রতি ঈদে সেজেগুজে এসে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে। ও আপনার খাতির– যত্ন করছে তো? আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছি ওর ওপর।'

'ও যত্ন করছে। ভালোই যত্ন করছে।'

'বাড়াবাড়ি রকমের যত্ন দিয়ে সে যদি আপনাকে বিরক্ত করে আমাকে বলবেন। আমি ধমক দিয়ে দেব। ও নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু–কিছু কাজ করে, যা সহ্য করা যায় না। একবার কী করেছে শুনুন—কোত্থেকে এক মৌলানা সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছে। মৌলানা সাহেব নাকি দোয়া পড়ে এই বাড়ির জিন তাড়াবেন। লম্বা কোর্তা পরা মৌলানা। প্রতিটি বাথরুমে ঢুকছে আর কি দোয়া–কালাম পড়ছে। দেখুন তো কী অস্বস্তিকর অবস্থা! বাথরুম কি দোয়া পড়ার জায়গা? আচ্ছা যাই, পরে কথা হবে। আপনার তদন্ত শেষ হতে কতদিন লাগবে?'

'বেশিদিন লাগবে না। প্রায় শেষ করে এনেছি।'

'তদন্ত শেষ হলে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবেন?

'তা তো বটেই।'

নাদিয়া হাসতে–হাসতে বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু তদন্ত শেষ হবার

পরেও আমার এখানে থেকে যেতে পারেন। আপনাকে কেন জানি না আমার পছন্দ হয়েছে। কী কারণে পছন্দ হয়েছে তা অবশ্যি আমি নিজেও ধরতে পারছি না।'

নাদিয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। মেয়েটির চেহারায় আচার-আচরণে মিসির আলি শোকের কোনো ছাপ দেখলেন না। পিতার মৃত্যুশোক সে কাটিয়ে উঠেছে। মনে হয় ভালোভাবেই কাটিয়েছে।

১০

গুলশান থানার ওসি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁর ওসি জীবনে এত বিরক্ত চোখে বোধহয় কারো দিকে তাকান নি। ওসি সাহেবের ঠিক সামনের চেয়ারে মিসির আলি বসে আছেন। মিসির আলি কয়েকবার খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। ওসি সাহেব পাত্তা দিলেন না। পাত্তা দেবার কথাও না। মিসির আলি নামের এই মানুষটি তাঁর সারাটা দিন নষ্ট করেছে। সকাল ন'টার সময় এসেছে, এখন বাজছে একটা। যাবার নাম নেই। চুপচাপ চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই বোধ-হয় মানুষটির নেই।

ওসি সাহেব হাই তুলতে-তুলতে বললেন, 'আজ চলে যান মিসির আলি সাহেব। আজ আর হবে না। দীর্ঘদিন আগের ব্যাপার। পুরানো রেকর্ডপত্র কোথায় আছে কে জানে। সতের বছর তো অল্প সময় নয়।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি বরং সন্ধ্যার দিকে একবার আসি।'

'সন্ধ্যার দিকে আসার দরকার নেই। সামনের সপ্তাহে খোঁজ নিয়ে যাবেন।'

'তথ্যটা জানা আমার খুব দরকার। সতের বছর আগে বাথরুমে অল্পবয়সী একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। এই বিষয়ে থানায় কোনো জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে কিনা, পোস্ট মার্টেম হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট........'

ওসি সাহেব অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, দেশটা বিলেত-আমেরিকা না—বাংলাদেশ। এই দেশে এক সপ্তাহ আগের জিনিসই পাওয়া যায় না। আপনি এসেছেন সতের বছর আগের ব্যাপার নিয়ে।'

'আমার খুব প্রয়োজন ছিল।'

'সতের বছর আগে কী ঘটেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বর্তমানে কী ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামান।'

'পাওয়া যাবে না বলছেন?'

'পাওয়া না-যাবারই কথা।'

'রেকর্ড নিশ্চয়ই কোথাও রাখা হয়।'

'তা রাখা হয়। ফাইলের গুদামে পড়ে থাকে। একসময় পোকায় কাটে। আমার ধারণা আপনি যে-রেকর্ডের কথা বলছেন তা এখন উই পোকার পেটে।'

'খুঁজে দেখবেন না?'

'উইপোকার পেট চিরে খুঁজতে বলছেন?'

'জ্বি-না—গুদামের কথা বলছি।'

'বললাম তো খোঁজা হচ্ছে।'

'তাহলে সন্ধ্যাবেলা একবার আসি?'

ওসি সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'আসুন। শুধু সন্ধ্যায় না। রাতে একবার আসুন। মাঝরাতেও আসুন।'

'আপনি মনে হচ্ছে আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, হচ্ছি। পুলিশে কাজ করি বলে কি বিরক্তও হতে পারব না? অনেক আজব চিড়িয়া আমি আমার পুলিশী জীবনে দেখেছি, আপনার মতো দেখি নি।'

'আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেছি বলে দুঃখিত।'

'শুধু বিরক্তি না ভাই, আপনি আরো অনেক জিনিস উৎপাদন করেছেন। তার মধ্যে রাগও আছে। নেহায়েত হোম ডিপার্টমেন্টের চিঠি আছে বলে কিছু বলি নি।'

মিসির আলি হাসলেন। ওসি সাহেব তীব্রগলায় বললেন, 'হাসছেন কেন?'

মিসির আলি বললেন, 'আর হাসব না। তবে আমি আসব। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আসব।'

১১

ডাক্তার মুসফেকুর রহমান, (এম.আর. সি. পি., প্রফেসর, পিজি হাসপাতাল) ওসি সাহেবের মতোই বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। ডাক্তারদের সময়ের দাম আছে। সেই দামী সময়ের অংশ নিতান্ত অকারণে কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না। মুসফেকুর রহমান সাহেবের ধারণা, মিসির আলি নামের মানুষটি নিতান্ত অকারণে তাঁর সময় নিচ্ছে। তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত, কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না। সভ্যসমাজের অনেক অভিশাপের মধ্যে একটা অভিশাপ হচ্ছে—যা করতে ইচ্ছা করে, তা করা যায় না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনাকে যা বলার তা তো বলেছি, তার পরেও বসে আছেন কেন?'

'এক্ষুণি চলে যাব। শুধু একটা জিনিস জানার বাকি, ওসমান গনি সাহেব কি কখনো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন?'

'আমি জানি না। আর জানলেও আপনাকে বলতাম না। ডাক্তারদের কিছু এথিকেল কোড মানতে হয়। রুগীর রোগ সম্পর্কে অন্যকে কোনো তথ্য না-দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একটি। কার কি অসুখ তা আমি অন্যদের বলব না।'

'কেন বলবেন না? ব্যাধি তো গোপন রাখার বিষয় নয়।'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, আমি বুঝতে পারছি আপনি মানুষটি তর্কে পটু। আমি আপনার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে যেতে চাচ্ছি না। ওসমান গনি সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সম্পর্কে আমি যা জানি তা আপনাকে বলেছি। এর বেশি কিছু জানি না।

'শেষের দিকে তিনি কোনো ধরনের হেলুসিনেশনে ভুগছিলেন কি?'

'আমার জানা নেই।'

'একটু মনে করে দেখুন তো তিনি কি কখনো কথা প্রসঙ্গে আপনাকে বলেছেন যে

তিনি তীব্র ভয় পাচ্ছেন বা এই জাতীয় কিছু?'

'হ্যাঁ, তা বলেছেন। বাথরুমে ঢুকলে তিনি ফিসফিস করে কথা শুনতে পান—যেন কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। বাচ্চা ছেলের গলা। ছেলেটা তাঁর নাম ধরে ডাকত। দুঃস্বপ্ন দেখতেন। তিনি একবার জানতে চাইলেন কেন এ-রকম হচ্ছে।'

'উত্তরে আপনি তাঁকে কী বলেন?'

'আমি বলি যে অতিরিক্ত টেনশানে এ-রকম হতে পারে। আমি তাঁকে টেনশান কমাতে বলি। তাঁকে ঘুমের অষুধ দিই।'

'কী অষুধ দেন?'

'এটাও কি আপনার জানতে হবে?'

'হ্যাঁ, জানতে হবে।'

ডাক্তার সাহেব খসখস করে কাগজে অষুধের নাম লিখে মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'এই অষুধটা দিই। আরো কিছু জানতে চান? এই অষুধ কীভাবে কাজ করে। কীভাবে নার্ভ শান্ত করে—এ-জাতীয় কিছু?'

'না, আর কিছু জানতে চাই না। আপনাকে যথেষ্ট বিরক্ত করা হয়েছে। ধন্যবাদ।'

মিসির আলি ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও বেরুলেন না। আবার ফিরে এসে আগের জায়গায় বসলেন। ডাক্তার সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'কি হল?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। ওসমান গনি সাহেবের মেয়ে নাদিয়া গনি, সে কি কখনো তার বাবার মতো সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল?'

'না, আসে নি। আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?'

'জ্বি, শেষ হয়েছে।'

'শেষ হয়ে থাকলে দয়া করে যান। দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে আসবেন না।'

১২

হোম মিনিস্টার সাহেব ফাইল থেকে মুখ না-তুলেই বললেন, 'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি ভালো।'

'ভালো থাকলেই ভালো। বসুন। হাতের কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। আপনার যা বলার—এর মধ্যেই বলতে হবে। আপনি আবার ভেবে বসবেন না, এটাও আমার একধরনের ভান। বেশি-বেশি কাজ দেখাচ্ছি . . . '

মিসির আলি বসলেন। মিনিস্টার সাহেব ফাইলে চোখ রেখে সহজ গলায় বললেন, 'খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'জ্বি-না।'

'পড়লে একটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখতে পেতেন। আমার মন্ত্রিত্ব চলে যাচ্ছে—অন্য একজন আসছেন।'

'সত্যি নাকি?'

'না, সত্যি না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকজন খবরের কাগজে যা পড়ে তা-ই বিশ্বাস করে। সবাই ঘটনা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। যে-কারণে আজ আমার কাছে কোনো দর্শনার্থী নেই। অন্যদিন ওয়েটিং রুম মানুষে গিজগিজ করত। আজ শুধু আপনি এসেছেন। খবরের কাগজ পড়েন নি বলে এসেছেন। পড়লে হয়তো আসতেন না। এখন বলুন কি ব্যাপার।'

'একটা পুরানো জিডি এন্ট্রি আমার দেখা দরকার। থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা বলেছে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কত দিনের পুরানো?'

'সতের বছর।'

'তাহলে না-পাওয়ারই সম্ভাবনা। তবু চেষ্টা করে দেখা যাবে। এখন বলুন, আপনার তদন্ত কতদূর? শুনেছি রোজ ভিলায় আছেন? সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই ভালো। এখন বলুন, কিছু পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

'এর মধ্যে পেয়েও গিয়েছেন! কী পেয়েছেন?'

'এটা যে হত্যাকাণ্ড এ-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি।'

'বাহ্, ভেরি গুড! তাহলে হত্যাকারী কে বলে ফেলুন। শুনে দেখি চমকে উঠি কি না।'

'হত্যাকারী কে, তা এখনো জানি না।'

হোম মিনিস্টার ফাইল বন্ধ করে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'ছোটোবেলায় ডিটেকটিভ বই খুব পড়তাম—এখনো পড়ি। একটা খুন হয়। বাড়ির সবাইকে খুনী বলে সন্দেহ হতে থাকে। যার ওপর সন্দেহ সবচেয়ে কম হয়—দেখা যায় সে-ই খুনী। আপনি ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন না কেন। এই মুহূর্তে কার ওপর আপনার সবচেয়ে কম সন্দেহ হচ্ছে?'

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এই মুহূর্তে সবচেয়ে কম সন্দেহ হচ্ছে আপনার ওপর।'

হোম মিনিস্টার তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'তার মানে? আপনি কি রসিকতা করার চেষ্টা করছেন?'

'জ্বি-না স্যার, আমি রসিকতা করার চেষ্টা করছি না। ওসমান গনির পরিবারের সঙ্গে আপনি পরোক্ষভাবে হলেও জড়িত। এই পরিবারের সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত।'

'ওসমান গনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতে গান শুনতে যেতাম। এর ভেতর স্বার্থ কী আছে?'

'আপনি আপনার মেজো ছেলেকে নাদিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছেন। নাদিয়া রাজি হচ্ছে না বলেই বিয়েটা হচ্ছে না।'

'বন্ধুর কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছা হওয়াটা কি দোষের কিছু?'

'মোটেই দোষের কিছু নয়, বরং এটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু দোষের কিছু বলি নি। আমি শুধু বলেছি—এই পরিবারের সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত। পরোক্ষভাবে হলেও জড়িত। কাজেই এই পরিবারে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটলে—আপনার কথাও ভাবা হবে।

আপনাকে বাইরে রাখা হবে না।'

'আমি যে নাদিয়ার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছি, এটা আপনাকে কে বলল? নাদিয়া?'

'জ্বি–না, সে বলে নি। নাদিয়ার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই হয়। সে বিব্রত বোধ করতে পারে বলে এই প্রশ্ন তাকে করি নি।'

'তাহলে আপনি কার কাছ থেকে এই তথ্য জানলেন?'

'এটা কি কোনো গোপন তথ্য যে, কেউ জানবে না? বিয়ের আলোচনা কেউ গোপনে করে না। তা ছাড়া আপনার ছেলেও তো অযোগ্য ছেলে না। খুবই যোগ্য ছেলে।'

'কী করে জানেন?'

'আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'আই সী। আপনি দেখি চষে ফেলছেন! গুড। চা খাবেন?'

'খেতে পারি।'

মিনিস্টার সাহেব চায়ের কথা বলে, মিসির আলির দিকে ঝুঁকে এসে নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কথা সত্যি। আমার স্বার্থ আছে। ভুল বললাম, স্বার্থ একসময় ছিল, এখন নেই। একসময় আমার ছেলেকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ওসমান গনিকে অনেক অনুরোধ করেছি। সে কখনো হ্যাঁ বলে নি, আবার কখনো নাও বলে নি। আমার মধ্যে লোভ কাজ করেছে। ওসমান কোটিপতি। কিন্তু মিসির আলি সাহেব, সেই লোভ এখন আর নেই। লোভের চেয়ে বাস্তবতা এখন বেশি কাজ করছে। আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে, নাদিয়া নামের মেয়েটি পুরোপুরি উন্মাদ। মেয়েটা রাতে ঘুমায় না। বারান্দার এ–মাথা থেকে ও–মাথা পর্যন্ত হাঁটে, আর খিলখিল করে হাসে। সিগারেট টানে। আপনি তো ঐ বাড়িতেই আছেন। আপনি লক্ষ করছেন না?'

'খিলখিল হাসি শুনি নি, তবে উনি রাত জাগেন তা সত্যি।'

'আমি সত্যি কথাই আপনাকে বললাম। তদন্ত করছেন, ভালোমতো করুন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বের হয়ে যেতে পারে।'

চা চলে এল। মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। মিনিস্টার সাহেব নিলেন না। রাগী–রাগী চোখে তিনি চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার কি ধারণা নাদিয়া মেয়েটি কিছু করেছে?'

'এখনো বলতে পারছি না।'

'তার পক্ষে করা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কিছু না। সবই সম্ভব।'

'কেন সে এটা করবে?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ হলেই করবে। তার মা'র কারণে একটা ছোট্ট বাচ্চা মারা গেছে। সেই থেকে মা'র ওপর তীব্র ঘৃণা জন্মাতে পারে। ঘৃণা এক পর্যায়ে ইনসেনিটিতে রূপ নিতে পারে। বলা হয়ে থাকে, নিতান্ত অপরিচিত একজনকে হত্যার চেয়ে পরিচিত একজনকে হত্যা অনেক সহজ।'

'কেন?'

'ঘৃণা ব্যাপারটি অপরিচিত কারো প্রতি থাকে না, কিন্তু পরিচিত জনের প্রতি থাকে।'

মিনিস্টার সাহেব বললেন, 'আমার ধারণা মেয়েটি কিছু করে নি, কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা, করেছে। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই মেয়ে পিশাচ ধরনের। একে বৌ করে আনলে আমরা সবাই মারা পড়ব।'

মিসির আলি বললেন, 'স্যার, আজ উঠি।'

মিনিস্টার সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

১৩

রাত এগারটায় নিয়মমতো মিসির আলি বিছানায় ঘুমুতে গেলেন। এ-বাড়িতে এসে খুব অনিয়ম হচ্ছে। রোজ ঘুমুতে দেরি হচ্ছে। সকালের মর্নিং-ওয়াক করা হচ্ছে না। মিসির আলির পরিকল্পনা হল, আজ থেকে আবার আগের নিয়মে ফিরে যাবেন।

বিছানায় শুয়ে হাতের কাছে রাখা টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেন। কিছুক্ষণ কোনো-একটা বই পড়ে চোখ ক্লান্ত করবেন—এতে চট করে ঘুম চলে আসে। মিসির আলির হাতের বইটির নাম GhostGirl, লেখিকা বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ টোরি হেডেন। বইটি লেখা হয়েছে ন' বছর বয়সী এক মেয়ে 'জেডি'কে নিয়ে। অসম্ভব রূপবতী এই বালিকা মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুলে তাঁর ছাত্রী ছিল। মেয়েটি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, কিন্তু কখনো কথা বলত না। তার শারীরিক কোনো অসুবিধা ছিল না, তবু সে থাকত কুঁজো হয়ে। যদিও সোজা হয়ে দাঁড়ানো তার জন্যে কোনো সমস্যা নয়।

মনস্তত্ত্ববিদ টোরি হেডেন এই আশ্চর্য মেয়েটির কথা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। মেয়েটির মনের ভেতরকার গোপন অন্ধকার এক-এক করে আলোতে বের করে নিয়ে এসেছেন। মিসির আলি দু' শ' পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটানা পড়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন, রাত বাজছে তিনটা। আরো তিরিশ পৃষ্ঠা বাকি আছে। এখন শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু বইটি শেষ না-করে ঘুমুতে যেতে তাঁর ইচ্ছা করল না।

আব্দুল মজিদ ফ্লাস্কে করে চা রেখে গেছে। তিনি এক কাপ চা এবং পরপর দু'টি সিগারেট খেলেন। সিগারেট খেতে-খেতে 'জেডি' নামে মেয়েটির কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, এ-জাতীয় মানসিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশেও আছে। কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্যে টোরি হেডেনের মতো প্রতিভাবান এবং নিবেদিত মনস্তাত্ত্বিক নেই।

মিসির আলি আবার বই পড়া শুরু করার আগে বাথরুমে ঢুকলেন। আব্দুল মজিদ বারবার করে বলেছে গভীর রাতে বাথরুমে গেলে যেন দরজা কখনোই বন্ধ না-করা হয়।

মিসির আলি দরজা বন্ধ করলেন। কেন জানি তাঁর একটু ভয় লাগল। সম্ভবত Ghost Girl পড়ার কারণে এটা হয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও ভয়ের একটা বীজ

মনের গভীরে ঢুকে গেছে। চোখে-মুখে পানি দেবার জন্যে ট্যাপ খুললেন—আশ্চর্য ব্যাপার, ট্যাপে এক ফোঁটা পানি নেই। চোখ-মুখ জ্বালা করছে। মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া দরকার। তাঁর ঘরে বোতলে পানি আছে। ঐ পানি নিয়ে আসা যায়। মিসির আলি বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। দরজা খোলা যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ। পরপর দু'বার চেষ্টা করলেন। নব ঘোরানোই যাচ্ছে না। আশ্চর্য তো! ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হালকা গন্ধ, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি নব ছেড়ে দিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে খানিকটা ভীত বলে মনে হল। তিনি নিঃশব্দে বাথরুমের অন্য প্রান্তে সরে গেলেন। এবং ছোট শিশুদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। আর তখনি বাথরুমের বাতি নিভে গেল। ঘর হল নিকষ অন্ধকার। এত অন্ধকার মিসির আলি এর আগে কখনো দেখেন নি। আলোর ক্ষীণ রেখা সব অন্ধকারেই থাকে—কিন্তু বাথরুমে তাও নেই। তাঁর শরীর কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে। এগুলি আর কিছুই না, সেন্স ডিপ্রাইভেশনের ফলাফল। কেউ হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলে ভয়াবহ মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হয়। তাঁরও তাই হচ্ছে। চোখ থেকেও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

মিসির আলি বসে আছেন চুপচাপ। তাঁর পকেটে সিগারেটের প্যাকেট এবং দিয়াশলাই আছে। ইচ্ছা করলেই তিনি দিয়াশলাই জ্বালাতে পারেন। জ্বালালেন না, বরং উবু হয়ে একটা বড় ধরনের কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই ঘটনা ঘটল। তিনি পরিষ্কার শুনলেন, ঠিক তাঁর কানের কাছে শিশুদের মতো গলায় কে-একজন ডাকল, 'মিসির আলি। এই মিসির আলি।'

জবাব দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলেন—একচুলও নড়লেন না। আবারো সেই অশরীরী শব্দ হল। বাথরুমের ভেতরে আবারো বালক-কণ্ঠে কে যেন বলল, 'মিসির আলি, তুমি কোথায়? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

একটু হাসির শব্দও যেন পাওয়া গেল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। মিসির আলি নিজেকে আরো ছোট করে বসে রইলেন আগের জায়গায়। তিনি যে- ভঙ্গিতে গুটিসুটি মেরে বসেছেন, তাকে বলে Mother's womb position. মায়ের পেটে শিশুরা এইভাবেই থাকে। বসে থাকার এই ভঙ্গিটি ভয় কাটাতে সাহায্য করে। কারণ মায়ের জরায় এমন এক স্থান, যেখানে ভয়ের কোনো স্থান নেই। শিশুর জন্যে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। ভয় পেলেই এই জায়গাটার জন্যে মানুষের মনে এক ধরনের ব্যাকুলতা জাগে।

মিসির আলি ভয় কাটানোর প্রচলিত পদ্ধতিগুলি নিয়ে দ্রুত ভাবছেন। ভয় কাটানোর সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে নগ্ন হয়ে যাওয়া। বলা হয়ে থাকে—ভৌতিক কোনো কারণে ভয় পেলে নগ্ন হওয়ামাত্র ভয় অর্ধেক কমে যায়। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী হতে পারে? মিসির আলির মাথায় আসছে না। মায়ের পেটে আমরা নগ্ন হয়ে ছিলাম এই কি ব্যাখ্যা? এটা নিয়ে এক সময় ভাবতে হবে।

ভয় কাটানোর আরেকটি পদ্ধতি হল বড়-বড় নিঃশ্বাস নেওয়া। এই পদ্ধতির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে—বড়-বড় নিঃশ্বাস নেবার অর্থ বেশি করে অক্সিজেন নেওয়া। শরীরে বেশি অক্সিজেন যাওয়া মানে মস্তিষ্কে বেশি অক্সিজেন যাওয়া।

তীব্র পিপাসা হচ্ছে। বুক-মুখ শুকিয়ে কাঠ। এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বন্ধ ঘর। অশরীরী কণ্ঠ। ফুলের গন্ধ—জমাট অন্ধকার—এর বাইরেও কি কিছু আছে?

মিসির আলি নিজের নাড়ি ধরলেন। নাড়ি খুব দ্রুত চলছে। কত দ্রুত তা অবশ্যি তিনি ধরতে পারছেন না। সঙ্গে ঘড়ি নেই। মনে হচ্ছে বাথরুমের এই অন্ধকার ঘরে সময় আটকে গেছে। কখনো বোধ হয় ভোর হবে না। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি। সময় শ্লথ হয়ে গেছে। ভোর হতে কত বাকি?

এক সময় সামান্য আলোর আভা দেখা গেল। ভোর বোধহয় হচ্ছে। মিসির আলি বাথরুমের দরজায় হাত রাখলেন। দরজা খুলে গেল। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। দরজা খুলে তিনি বাইরে এলেন। আকাশ ফরসা হলেও চারদিক এখনো অন্ধকার। এই অন্ধকারে সবুজ শাড়ি পরে নাদিয়া ঘুরছেন। মিসির আলিকে দেখে তিনি খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'আরে, আপনি কি রোজ এত ভোরে ওঠেন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'রোজ উঠি না, আজ উঠলাম।'

'ভেরি গুড। আসুন, একসঙ্গে খানিকক্ষণ হাঁটি। চা দিতে বলেছি। চা খেতে-খেতে হাঁটার মধ্যে অন্য এক ধরনের আনন্দ আছে।'

মিসির আলি বাগানে নেমে এসে বললেন, 'আমি আজ চলে যাব। আপনার বাড়িতে বেশ আনন্দে সময় কেটেছে। আপনাকে ধন্যবাদ।'

নাদিয়া ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আজ চলে যাবেন মানে? আপনি কি সমস্যার সমাধান করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। আপনি সকালে নাশতা খাবার সময় এ-বাড়িতে যারা উপস্থিত আছে সবাইকে ডাকুন, আমি সবার সামনে ব্যাখ্যা করব।'

'সবার সামনে ব্যাখ্যা করার দরকার কী? আমাকে বলুন।'

'আমি সবার সামনেই বলতে চাই।'

নাদিয়া কিছুক্ষণ স্থির চোখে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। মিসির আলিও হাসলেন।

মেয়েটি আজও সবুজ শাড়ি পরেছে। মেয়েটি বোধহয় কালার-ব্লাইন্ড। একমাত্র কালার-ব্লাইন্ডদেরই বিশেষ কোনো রঙের প্রতি দুর্বলতা থাকে। মিসির আলি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে কালার-ব্লাইন্ড ছিলেন তা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। আপনার কাছে প্রথম শুনলাম।'

'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালার-ব্লাইন্ড। তিনি সবুজ রঙ দেখতে পেতেন না।'

নাদিয়া বললেন, 'তাতে তাঁর সাহিত্যের বা গানের কোনো ক্ষতি হয় নি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি হঠাৎ করে কালার-ব্লাইন্ডের প্রশ্ন তুললেন কেন?'

'এমি তুললাম। কোনো কারণ নেই।'

'আপনি কি সত্যি-সত্যি রহস্যের মীমাংসা করেছেন?'

'মনে হয় করেছি।'

'মনে হয় বলছেন কেন? আপনি কি নিশ্চিত না?'

'না। প্রকৃতি মানুষকে Truth-কে স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু Absolutetruth-কে স্পর্শ করার অনুমতি দেয় নি। ঐটি প্রকৃতির রাজত্ব। মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।'

১৪

বাড়ির সবাই এসেছে।

মিসির আলি তাদের চোখে মুখে কৌতূহল এবং সেইসঙ্গে চাপা উদ্বেগ লক্ষ্য করলেন। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে সাফকাতকে। সে রীতিমতো ঘামছে। ঘন-ঘন ঢোক গিলছে। মিসির আলি কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। নাদিয়া বললেন, 'বলুন কি বলবেন। চুপ করে আছেন কেন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে খানিকক্ষণ কেশে গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন—

'কাল রাতে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। আমার বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাতি নিভে গিয়েছিল। আমি অশরীরী একটি কণ্ঠ শুনলাম। একটা বাচ্চা ছেলে—আমার নাম ধরে ডাকল। ফুলের গন্ধ পেলাম। আপনারা বুঝতেই পারছেন, ভয়াবহ ব্যাপার। আমি আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলাম। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কিন্তু এ-জাতীয় একটি পরিস্থিতির জন্যে মনে-মনে তৈরি ছিলাম। আমি জানতাম একদিন-না-একদিন এ-রকম ঘটনা আমার ক্ষেত্রে ঘটবে। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বাতি নিভে যাবে। গলার আওয়াজ শুনব। ফুলের গন্ধ পাব। আমি খুব ভালোমতো জানতাম, পুরো ব্যাপারটা সাজানো। তার পরেও আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি।....

'আমি আমার নিজের ভয় থেকেই বুঝতে পারছি, ওসমান গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী কী পরিমাণ ভয় পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, ওসমান গনি সাহেবকে এই অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমার ধারণা, তিনি আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ভয় পেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন না যে পুরো ব্যাপারটা সাজানো। তিনি ধরেই নিয়েছেন যা ঘটছে সবই সত্যি। একটা ভয়ংকর ভৌতিক কাণ্ড তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এর সঙ্গে তিনি জড়িয়েছেন একটি শিশুর অপমৃত্যু।'

নাদিয়া মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'সাজানো ঘটনা কেন বলছেন? সাজানো ঘটনা বলার পিছনে আপনার যুক্তি কী?'

'যুক্তির অংশে যাবার আগে আপনি আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছিল বাথটাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কতটুকু পানি ছিল বাথটাবে?'

'অল্প পানি ছিল।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ঐ রাতে কলে পানি ছিল না?'

'আমার তেমন কিছু মনে পড়ছে না। পানি আছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'পানি না-থাকাটাই কিন্তু স্বাভাবিক। পানি থাকলে বাথটাব পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকলে আপনি দেখতেন তখনো কল দিয়ে পানি পড়ছে। আপনি নিশ্চয়ই তা দেখেন নি?'

নাদিয়া বললেন, 'আমি এত কিছু লক্ষ করি নি। তবে বাথরুমে ঢুকে আমি কল

দিয়ে পানি পড়তে দেখি নি। বাথরুমে পানি ছিল কি ছিল না, তা এত জরুরি কেন?'

'জরুরি কেন, বলছি।..........

'এক-এক করে বলি। ছোটবেলায় আমরা একধরনের খেলা খেলতাম। খেলার নাম 'টক্কা খেলা'। পেঁপে গাছের পাতা দিয়ে খেলাটা খেলা হত। পেঁপে গাছের পাতার লম্বা ডাঁটাটা ফাঁপা। সেই ফাঁপা ডাঁটায় মুখ লাগিয়ে একজনের কানের কাছে ডাঁটার অন্য প্রান্ত নিয়ে বিকট চিৎকার করা—''টক্কা টক্কা''। এই হচ্ছে টক্কা খেলা। শব্দ শুনে কানে তালা লেগে যেত।..........

'পেঁপে পাতার ডাঁটা না নিয়ে একটা লম্বা নল যদি নেওয়া হয়, সেই নলে মুখ লাগিয়ে কেউ কথা বললে, নলের অন্য প্রান্তে যে আছে সে কথা শুনবে। শব্দ প্রবাহিত হয় বায়ুর মাধ্যমে। নলের ভেতর আছে বায়ু।..........

'এখন দেখা যাক বাথরুমে কী ঘটেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলি—দরজা আটকে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি ঠিক আমার কানের কাছে একটা বাচ্চা ছেলের গলা শুনলাম। ভয়ংকর ব্যাপার তো বটেই। তবে ঘটনা কিন্তু সহজ। এক ধরনের টক্কা খেলা।'

নাদিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'টক্কা খেলা মানে?'

মিসির আলি বললেন, 'বাচ্চা ছেলের প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে কথা বলে নি। প্রেতাত্মা সেজে অন্য কেউ কথা বলেছে—খুব সম্ভব একটি মেয়ে কথা বলেছে। মেয়েদের গলার স্বর বাচ্চাদের মতো হাই পিচের হয়ে থাকে। সে কথা বলেছে অন্য কোনো বাথরুমে বসে। বাথরুমের পানির ট্যাপের কাছে মুখ নিয়ে। যেহেতু নলে কোনো পানি নেই, ফাঁপা নল, সেহেতু টক্কা খেলার মতোই শব্দ ভেসে এসেছে আমার বাথরুমে। এই হল ব্যাপার।'

নাদিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, পানির ট্যাংক ভর্তি থাকে পানিতে। পানির ট্যাপ পুরোপুরি পানিশূন্য হতে হলে ট্যাংক খালি হতে হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমার ধারণা ট্যাংক থেকে যে পাইপ এসেছে সেই পাইপে স্টপার আছে। অর্থাৎ ট্যাংক ভর্তি রেখেও স্টপার আটকে দিয়ে পানির পাইপ খালি করা যায়। যে-কোনো একটা ট্যাপ খুলে রাখলেই পাইপের সব পানি বের হয়ে আসবে।'

সাফকাত বলল, 'স্যার ঠিক কথাই বলেছেন। পাইপের মুখে একটা চাবি আছে। আমার মনে আছে, ঐ রাতে পানি ছিল না। আমি চাবিতে গণ্ডগোল আছে কি না দেখার জন্যে ছাদে গিয়েছিলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'এখন আপনারা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা করা হচ্ছে ভয় দেখানোর জন্যে। এমন ভয়, যেন সেই ভয়ে হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা খুব সহজ। বাইরে থেকে কেউ খুব শক্ত হাতে নবটা চেপে ধরলেই হবে।'

সাফকাত বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না—আপনার ঘরের ব্যাপারটা ধরুন। আপনার বাথরুমের নব চেপে ধরতে হলে আপনার শোবার ঘরে ঢুকতে হবে। কিন্তু আপনার শোবার ঘর ছিল তালাবন্ধ।'

'হ্যাঁ, তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু সাফকাত সাহেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন—এ-বাড়ির প্রতিটি বন্ধ দরজা চাবি দিয়ে বাইরে থেকে খোলা যায়। কাজেই এমন কেউ

আমার ঘরে ঢুকেছে যার কাছে আছে চাবির গোছা। আমি যতদূর জানি এ–বাড়িতে দু' সেট চাবি আছে। এক সেট আছে নাদিয়া গনির কাছে। অন্য সেট থাকে মিউজিক লাইব্রেরি ঘরের ড্রয়ারে।..........

কেউ একজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমার ঘরে ঢুকেছে। এক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে আমার বাথরুমের নব। অন্য হাতে বাথরুমের সুইচ নিভিয়ে দিয়েছে। আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, এ–বাড়ির প্রতিটি বাথরুমের সুইচ বাইরে। কাজেই যে ভয় পাওয়াতে চাচ্ছে, তার জন্যে খুব সুবিধা হয়ে গেল।..........

বুঝতেই পারছেন—ভয় দেখানোর এই ভয়ংকর খেলা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। খুব কম করে হলেও দু' জনের টীম দরকার। খুব ভালো টীমওয়ার্ক ছাড়া এ–কাজ হবে না। একজন বাথরুমের দরজার নব চেপে ধরে থাকবে, অন্যজন অন্য কোনো বাথরুমের ট্যাপে মুখ লাগিয়ে কথা বলবে।..........

আপনাদের আমি আগেই বলেছি, আমাকেও যে ভয় দেখানো হবে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম এবং মনে–মনে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াও অন্য ধরনের প্রস্তুতিও আমার মধ্যে ছিল। রাতের বেলা আমি যতবার বাথরুমে যেতাম ততবারই বাথরুমের বাইরের নবে কয়েক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ দিয়ে রাখতাম। দ্রবণটা পানির মতো বর্ণহীন, দু'–এক ফোঁটা দ্রবণে নবটা ভেজা–ভেজা থাকত। বাথরুমের নব ভেজা থাকা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যে ভয় দেখাতে আসছে, সে কোনো কিছু না–ভেবেই নবে হাত দেবে। সঙ্গে–সঙ্গে তার হাতে দাগ পড়ে যাবে। সিলভার নাইট্রেটের দাগ কঠিন দাগ। সপ্তাহখানেক থাকবেই। আমি আরো একটি জিনিস করেছি। বাথরুমের দরজার সামনে যে দাঁড়াবে, তার পায়ের ছাপ যেন ভালোমতো পড়ে তার ব্যবস্থা করেছি।..........

কেড্‌স জুতোর ছাপ আমার বাথরুমের দরজার সামনে আপনারা দেখতে পাবেন। জুতোর নাম্বার হচ্ছে বার। আব্দুল মজিদ এই জাতীয় জুতো পরে। আব্দুল মজিদ যদি তার হাত খোলে তাহলে সেখানে আমরা সিলভার নাইট্রেটের দাগ দেখতে পাব বলেই আমার ধারণা।'

কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শুধু সালেহার চোখ ভেজা। চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে মজিদের দিকে। আব্দুল মজিদের দু' হাত মুঠিবদ্ধ। সে বসে আছে মাথা নিচু করে। সে কারো দিকেই তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি আব্দুল মজিদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগলেন।

'ফুলের গন্ধের ব্যাপারটা আপনাদের বলি। আমি ফুলের গন্ধ পেয়েছিলাম। এটা আসলে ছিল জর্দার গন্ধ, আসত আব্দুল মজিদের মুখ থেকে। জর্দা খাওয়ার কারণে সে সব সময় মুখে জর্দার গন্ধ নিয়ে বেড়ায়, নিজে তা বুঝতে পারে না। কারণ এই গন্ধে সে অভ্যস্ত। আব্দুল মজিদের ওপর সন্দেহ হবার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সে একসময় রানা কনস্ট্রাকশানে প্লামিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই শূন্য নলের ভেতর শব্দ পরিচালনার ব্যাপার সে জানত। জানা বিদ্যাই সে ব্যবহার করেছে।..........

এখন আসা যাক হত্যাকাণ্ডগুলি কীভাবে করা হল। প্রথম হত্যা—নাদিয়ার মা'র মৃত্যুর জন্যে আব্দুল মজিদ এবং তার মা দায়ী নয় বলেই আমার বিশ্বাস। শিশুটি মারা

যাবার পর এই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তীব্র অপরাধবোধের কারণে বাথরুমে গেলেই তাঁর মনে হত বাথরুমের দরজা বোধ– হয় আর খুলবে না। এগুলি আমার অনুমান। ভয় পেয়ে হার্টফেল করে তিনি বাথরুমে মারা যান। ওসমান গনিকে হত্যার জন্যে আব্দুল মজিদ এবং তার মা এই ব্যাপারটি সুন্দর করে ব্যবহার করে। সুযোগ পেলেই তারা ভয় দেখাতে থাকে। বাড়িতে ভয়ংকর এক আবহাওয়াও তারা তৈরি করে। সবাইকেই ভয় দেখায়, যাতে করে সবার মনে এক সময় এই ধারণা হয় যে বাড়িতে ভৌতিক কিছু আছে। এটা আর কিছুই না, পরিবেশ তৈরি করা। মজিদ আশা করতে থাকে ওসমান গনির স্ত্রী যেভাবে মারা গেছেন—ওসমান গনিও সেইভাবে মারা যাবেন। ভয় পেয়ে হার্টফেল করবেন। তাই হয়। সুন্দর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। সুন্দর এই কারণে যে, হত্যাকারী হত্যা করে অনেক দূর থেকে। প্রচলিত আইনে এ–জাতীয় হত্যাকারীর বিচার আমার ধারণায় সম্ভব নয়।..........

এখন হত্যার মোটিভে আসি। মোটিভ জটিল নয়, সহজ। পরিবারের তিন সদস্যের দু' জন শেষ, একজন বাকি। সেই একজন শেষ হলে—বিপুল সম্পত্তি চলে যাবে আব্দুল মজিদ এবং তার মার হাতে। কারণ এরাই ওসমান গনির নিকট আত্মীয়। আমার যা বলার আমি বলেছি। আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে–দাঁড়াতে বললেন, 'আমি আমার নিজের আস্তানায় চলে যাব। আমার কাজ শেষ। নাদিয়া, আপনি কি আপনার ড্রাইভারকে একটু বলে দেবেন আমাকে পৌঁছে দিতে?'

নাদিয়া পাথরের মতো মুখ করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে না, মিসির আলির কোনো কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। মিসির আলি আব্দুল মজিদের মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার একটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ বলেন, নিয়তিকে গালি দিও না, কারণ আমিই নিয়তি।" এটা কোথায় আছে বলুন তো? কোন সূরা?'

বৃদ্ধা জবাব দিলেন না। স্থির চোখে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'নাদিয়া বলছিলেন, আপনি নাকি খুব সুন্দর গল্প বলতে পারেন। আমার খুব ইচ্ছা একদিন এসে আপনার গল্প শুনি। যদি অনুমতি দেন একদিন এসে আপনার গল্প শুনব। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই।'

গাড়ি মিসির আলিকে নিয়ে রওনা হয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন, এ–বাড়ি ছেড়ে রওনা হবার সময় নাদিয়া এসে বিদায় দেবেন। কিছু বলবেন। নাদিয়া দোতলা থেকে নিচে নামেন নি। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় এই মেয়েটির সুন্দর মুখ আরেক বার দেখতে ইচ্ছা করছিল। জানতে ইচ্ছা করছিল সবুজ শাড়ি এই মেয়েটির এত প্রিয় কেন। জানা গেল না।

মিসির আলি খুব ক্লান্ত বোধ করছেন। তাঁর অনেক দিনের সাথী 'তীব্র মাথার যন্ত্রণা' আবার ফিরে এসেছে। চোখ জ্বালা করছে। তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। রহস্যের জট খোলার মধ্যে তীব্র আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তিনি পাচ্ছেন না। কারণ রহস্যের একটি অংশের জট তিনি খুলতে পারেন নি। একটি অংশ এখনো অমীমাংসিত। অম্বিকাবাবু কেন তাঁকে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ালেন? তিনি কি আগাম জানতেন এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে? যদি

জানতেন, তাহলে কীভাবে জেনেছেন? ওসমান গনির কথাবার্তা থেকে আঁচ করেছিলেন? তিনি কখনো ওসমান গনির বাসায় যেতেন না। দূর থেকে এত বড় একটি ঘটনা আঁচ করা কি সম্ভব? তাহলে কি তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁকে সাহায্য করেছে? তা হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে কিছু নেই।

অম্বিকাবাবু কেন ওসমান গনির বাড়িতে কখনো যেতেন না? মিসির আলির মনে ক্ষীণ সন্দেহ—হয়তো-বা ওসমান গনির পালক পুত্রটি অম্বিকাবাবুর। তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে এদের হাতে তুলে দেন। তা যদি হয়, তাহলে অম্বিকাবাবুর ওসমান গনির বাড়িতে না-যাওয়ার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। অম্বিকাবাবু কেন তাঁর ছেলেকে দিয়ে দেবেন? এ-জাতীয় ঘটনা দরিদ্রদের মধ্যে ঘটে। অম্বিকাবাবু হতদরিদ্রের মধ্যে পড়েন না। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। তাছাড়া পুত্রের স্থান হিন্দু সমাজে অনেক ওপরে। মুখাগ্নিতে পুত্রের প্রয়োজন। মৃত্যুর পর পুত্রহীন পিতামাতার স্থান হয় পুন্নম নরকে। এমন অবস্থায় কেউ তার নিজের ছেলেকে দিয়ে দেবে, তা বিশ্বাস্য নয়। মিসির আলি আশা করেছিলেন গুলশান থানার ওসি সাহেব এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবেন। ছেলেটির অপঘাত মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়েছিল। সেখানে ছেলেটির সত্যিকার বাবার নাম থাকার কথা। কিন্তু ওসি সাহেব কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। সতের বছরের পুরানো কাগজপত্র জোগাড় করা যায় নি। তবে এই রহস্যের সমাধান তেমন জটিল নয়। অম্বিকাবাবু এবং তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। এমনও হতে পারে অম্বিকাবাবুর পুত্রের যখন ছ'মাস বয়স তখন তাঁর স্ত্রী মারা যান। ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে অম্বিকাবাবু খুবই বিব্রত বোধ করতে থাকেন ......অতসীকে জিজ্ঞেস করলেই তো জানা যাবে কবে তার মা মারা গিয়েছেন। মিসির আলির কেন জানি জানতে ইচ্ছা করছে না। থাকুক না কিছু রহস্য অমীমাংসিত। প্রকৃতি সব রহস্য মানুষকে জানাতে চায় না। কিছু নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। থাকুক না সেই সব রহস্য লুকানো। সব জানতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?

সারা রাতের অনিদ্রা এবং ক্লান্তির কারণেই হয়তো-বা মিসির আলির তন্দ্রার মতো হল। তন্দ্রার মধ্যেই তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে সাত-আট বছরের একটি বালককে দেখা গেল। বালকটি ছুটতে-ছুটতে তাঁর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল। মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে খোকা?' ছেলেটি না-সূচক মাথা নাড়ল। স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলির মনে হল—এই সেই ছেলে—যে বাথরুমে কঠিন মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে।

মিসির আলি বললেন, 'তুমি বাথরুমে মারা গিয়েছিলে, তাই না খোকা?'

ছেলেটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'বুঝলে খোকা—এ হচ্ছে নিয়তি। নিয়তিকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই—কারণ নিয়তি হচ্ছে ঈশ্বর স্বয়ং।'

ছেলেটি আবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

ছেলেটি নিচু গলায় বলল, 'আপনি আমার বোনকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছি।'

'কী উপহার?'

'তা বলব না।'

ছেলেটি খুব হাসতে লাগল। মিসির আলির ঘুম ভেঙে গেল। অন্য যে-কেউ এই স্বপ্নে অভিভূত হত, মিসির আলি হলেন না। কারণ তিনি জানেন, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাই স্বপ্ন হিসেবে তাঁর কাছে এসেছে। এর বেশি কিছু না।

গাড়ির ড্রাইভার বলল, 'গান দেব স্যার?' মিসির আলি হ্যাঁ, না কিছু বললেন না। ড্রাইভার গান দিয়ে দিল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে গান শুনতে লাগলেন—

'এস কর স্নান নবধারা জলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে . . .'

মিসির আলির মনে হল ধারাজলে স্নানের এই আমন্ত্রণ সবার জন্যে। কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করে না, নীপবন থাকে শূন্য ......